দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।। ৩১ ভাদ্র - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।।

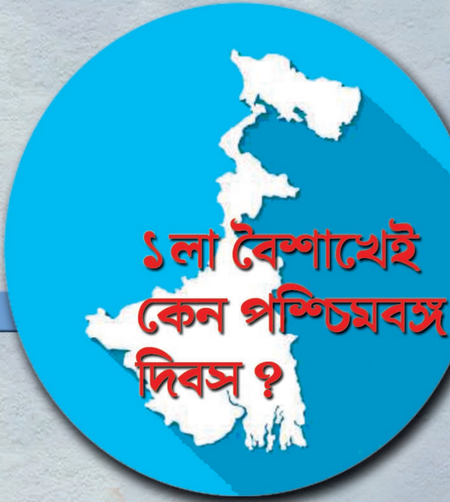

দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থেই
এক দেশ এক নির্বাচন

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৮ সেপ্টেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

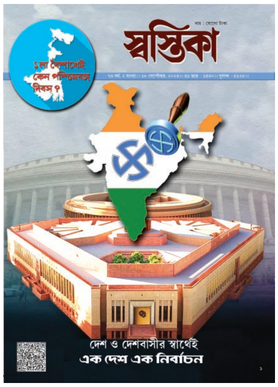

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

শিকেয় ইন্ডিজোট তাই বাম-কংগ্রেসের কবর খুঁড়ছেন মমতা তৃণমূলে অশনি সংকেত ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বিশ্বের দরবারে ভারতের জয়গান তবু মোদী নিপাত যাক ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ইন্ডিয়া না ভারত বিতর্ক এই নামকরণের মতো তুচ্ছ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয় ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

শিবাজীর বাঘনখ ফিরে পাচ্ছে ভারত ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের ইতিহাস ও বর্তমান কর্তব্য ◻ মোহিত রায় ◻ ১১

উৎসব নয়, ইতিহাস চাই ◻ শিলাদিত্য ঘোষ ◻ ১৩

বিশে জুন হিন্দুদের জন্য একটি হোমল্যান্ড আদায় করার রোমহর্ষক দিন ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ১৫

বারুদের গন্ধে ভরে উঠেছে এ রাজ্যের বাতাস ◻ সঞ্জীব দে ◻ ১৯

তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী ঐতিহাসিক দিনটিকে অস্বীকার করছেন ◻ ইন্দ্র মোহন রাভা ◻ ২০

দেশের স্বার্থে এক দেশ এক নির্বাচন প্রয়োজন ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ২৩

এক দেশ এক নির্বাচনে একমত হলে তা একযোগে দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৫

আনন্দই জীবনবেদ—আনন্দই ব্রহ্ম ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

গণেশপূজার ইতিবৃত্ত ◻ কানু রঞ্জন দেবনাথ ◻ ৩৪

পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা ◻ সুজিত রায় ◻ ৩৬

পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান সুরাবর্দির মতোই ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা** : ২১ ◻ **সুস্বাস্থ্য** : ২২ ◻ **সমাবেশ সমাচার** : ২৯-৩০ ◻ **অন্যরকম** : ৩৯ ◻ **নবাঙ্কুর** : ৪০-৪১ ◻ **খেলা** : ৪৫ ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন** : ৪৬-৪৮

প্রকাশিত হবে
২৫ সেপ্টেম্বর,
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জি-২০ সম্মেলন ও ভারত

সম্প্রতি ভারতের সভাপতিত্বে ভারতে অনুষ্ঠিত হলো জি-২০ সম্মেলন। সম্মেলনের থিম ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে তেমনই ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও হয়েছে। গৃহীত হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন ড. বিমল শঙ্কর নন্দ, আনন্দমোহন দাস প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

প্রকাশিত হবে
২৫ সেপ্টেম্বর,
২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইতিহাস স্মরণে রাখিতে হইবে

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হইবার পর তাঁহার সরকার দেশহিতার্থে যে সমস্ত সংস্কার রূপায়ণ করিয়াছে তাহা তাহাদের হঠাৎ মস্তিষ্কপ্রসূত নহে। তাহা তাহারা বহুবৎসর যাবৎ তাহাদের নির্বাচনী সংকল্পপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়াছে। সংসদের দুই কক্ষে বিস্তর আলাপ-আলোচনা করিবার পরই তাহা রূপায়িত হইয়াছে। ইদানীং এক দেশ এক নির্বাচনের বিষয়টি মাথায় রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর মাথায় হঠাৎ আসিয়াছে তাহা নহে। ২০১৪ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হইবার পরই তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার পর ইহা লইয়া বহুবার আলোচনা হইয়াছে। কেননা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একযোগে না হইবার কারণে বিশাল পরিমাণ অর্থ এবং বিপুল সময়ের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়নের গতিও রুদ্ধ হইয়া পড়ে। নির্বাচনী বিধি লাগু হইবার কারণে কোনোপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মও করিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া কেন্দ্র অথবা রাজ্যের প্রশাসনকেও নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়। উভয় মন্ত্রীমণ্ডলীকেও নির্বাচনী প্রচারকার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই মোদী সরকার কেন্দ্রীয় নির্বাচন ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একযোগে করিবার কথা ভাবিয়াছেন। তাহার জন্য পূর্বতন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া একটি রিপোর্ট সংসদে পেশ করিবে। ইহার জন্য আঠারো হইতে বাইশ সেপ্টেম্বর পাঁচদিনের সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হইয়াছে। নিঃসন্দেহে মোদী সরকারের অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় ইহাও একটি শুভ পদক্ষেপ। দুই-একটি বিরোধী দল ইহাকে স্বাগতও জানাইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছে। আঞ্চলিক দলগুলির বিরোধিতার কারণ রহিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে জাতীয় স্বার্থ বলিতে কিছুই নাই। তাহাদের ভয়, একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন হইলে জনমত কেন্দ্রের দিকেই ভারী পড়িবে। কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতার কারণ হইল, তাহারা কোনোকালেই দেশের প্রতি দায়বদ্ধ নহে। দেশের ভালো-মন্দের চিন্তা তাহাদের মাথায় নাই। নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতাই তাহাদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা। ইতিহাস তাহারা স্মরণে রাখিতে পারে না। স্বাধীনতার পর দেশের তিনটি নির্বাচন— ১৯৫৭, ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের তখন একাধিপত্য ছিল। তাহারাই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, বারে বারে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে বরখাস্ত করিয়া দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক ব্যবস্থাটির অবলুপ্তি ঘটাইয়াছিল। মোদী সরকার তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলিতেই তাহারা ইহার বিরোধিতা শুরু করিয়াছে। দেশের মানুষ কিন্তু মোদী সরকারের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাইতেছে।

দেশের মানুষের নিকট ইহা পরিষ্কার যে কংগ্রেস এবং তাহার উপজাত দলগুলি বৌদ্ধিক দেউলিয়ায় ভুগিতেছে। কংগ্রেসের সাম্প্রতিকতম উপজাত দলটি পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির জন্মদিবসকে পর্যন্ত মানিয়া লইতে পারিতেছে না। বর্তমানে তাহারা রাজ্যের শাসকদলও বটে। তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে তাহারা জর্জরিত। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পাকিস্তানের গ্রাস হইতে বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিমাংশ পশ্চিমবঙ্গকে বাঙ্গালি হিন্দুর বাসভূমিরূপে ড. শ্যামাপ্রসাদ ছিনাইয়া আনিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টাকেই অপমান করিলেন। ইতিহাস ভুলাইয়া দিতে কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা বারাবরই সিদ্ধহস্ত। কংগ্রেসের উপজাত বর্তমান শাসকদল একই খেলায় মাতিয়াছে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালি হিন্দুর আফিমের নেশা কাটিয়াছে। তাহারা শ্যামাপ্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিশে জুন আর ভুলিবে না। বাঙ্গালি হিন্দুর চিন্তা-চেতনায় তাহা এখন অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

সুভাষিতম্

অহিং নৃপং চ শাদূলং বৃদ্ধং চ বালকং তথা।

পরশ্বানং চ মূর্খং চ সপ্ত সুপ্তান্ন বোধয়েৎ।।

সর্প, রাজা, সিংহ, বৃদ্ধ, বালক, অন্যের কুকুর এবং মূর্খ — এই সাত শুয়ে থাকলে জাগানো উচিত নয়।

শিকেয় ইন্ডিজোট তাই বাম-কংগ্রেসের কবর খুঁড়ছেন মমতা

তৃণমূলে অশনি সংকেত

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজনীতিতে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাই ডেডলাইন সেপ্টেম্বর। মনে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খবরটা পৌঁছয়নি। অভিষেকবাবুকে ইডি যে এত তাড়াতাড়ি জেরা করতে চাইবে সেটা হয়তো তারা বুঝতে পারেননি। কিংবা সব জেনেও মমতা চুপ ছিলেন। শোনা যাচ্ছে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে শাসক তৃণমূলের কয়েকজন বড়ো নেতা দুর্নীতির দায়ে ফাঁসতে চলেছেন। তাই তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। ইডি অভিষেকবাবুকে জেরা করতে চেয়েছে। আদালতের কাছে তাদের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় সে সময় মমতার স্পেনে থাকার কথা। যদি না ব্যতিক্রম ঘটে। অভিষেকবাবু ইন্ডিজোটের বৈঠকের ছুতো দেখিয়ে জেরা এড়ানোর গান গেয়ে রেখেছেন। মমতার না থাকার দুটো মানে হতে পারে— মমতা জানেন জেরায় অভিষেক গ্রেপ্তার হবেন না। কিংবা মমতা অভিষেকবাবুর পরিণতি জেনেও সব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

তৃণমূল মহলের আলোচনা— মমতা থাকবেন না জেনেই ইডি অভিষেকবাবুকে জেরা করতে চেয়েছে। এক সময়ের পলাতক পুলিশ কর্তা রাজীব কুমার গ্রেপ্তারে সিবিআইয়ের অন্তরায় হয়েছিলেন মমতা। এ রাজ্যের অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন না অভিষেকবাবু বা মলয় ঘটকের মতো নেতারা দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়তে পারেন। এখনও অবধি তদন্তে কোনো লাভ হয়নি। তবে এটাও প্রমাণ হয়নি যে তদন্ত ভুয়ো, ওই দু'নেতা চক্রান্তের শিকার। গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াটি খোলা পাতার মতো হওয়ায় সবাই তা পড়ে ফেলছে। তাতেই বিপত্তি ঘটছে। তদন্তের বল পাস করে খেলার নিদান দিয়েছেন মমতা। তাঁর দলের সদস্যদের জানিয়েছেন তদন্ত বা তদন্তকারীদের রেয়াত না করতে। অসুবিধায় পড়লে আদালতের আশ্রয় নিতে। কারণ মামলা চলবে। এর দুটি মানে হতে পারে— অন্যায় করেও আদালতের গেলে তা দীর্ঘায়িত হবে। আর সেই সময়ের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের তত্ত্ব ছড়াতে থাকবে।

জনস্মৃতি দুর্বল। মানুষ তাড়াতাড়ি ভুলে যান। কিছুদিন পর চক্রান্তের তত্ত্ব কায়েম হবে। আর অন্যায় থাকলেও তার প্রতিকার ঝুলে থাকবে। অন্য একটি ধারণা হতে পারে মমতা হয়তো আর তার দলের দোষীদের সঙ্গে সাথ দিতে নারাজ। মমতা বুঝেছেন পাপের ঘড়া পূর্ণ। তাই রাজনৈতিক হাত ধুয়ে ফেলে তাদের আদালতের সাহায্য নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। মমতার সব কথাই ইঙ্গিতবাহী। তিনি কিছু খুলে বলেন না। ছুতো করে পালিয়ে বাঁচা তৃণমূল নেতাদের নতুন কৌশল। মমতা তাঁর সঙ্গে জুড়েছেন আলাদতকে। সোনায় সোহাগা। মলয়বাবু চোদ্দবার তদন্ত এড়িয়েছেন। অভিষেকবাবু আদালতের দরজায় ঘুরছেন। দোষী প্রমাণিত হলে ফাঁসিতে চড়ার হুংকার দিচ্ছেন। সুজিত বসু সিবিআই তদন্তের চিঠি খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ সকলে সে চিঠি পেয়েছেন। মিথ্যাচার আর ভয় এ যুগের রাজনীতিকদের সহজাত।

> অস্বস্তিকর অভিযোগ সামলাতে তৃণমূল নেতারা অন্য রাজ্যের সমস্যা তুলে ধরেছেন। কারণ এটাই নতুন কৌশল। ইংরেজিতে বলা হয় 'হোয়াট-অ্যাবাউটরি'।

পশ্চিমবঙ্গ তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যে করে হোক কেন্দ্রীয় তদন্ত এড়ানোর বার্তা দিয়েছেন মমতা। তাই অভিষেকবাবু ইডির জেরায় হাজির থাকেন কিনা সেটাই দেখার। অস্বস্তিকর অভিযোগ সামলাতে তৃণমূল নেতারা অন্য রাজ্যের সমস্যা তুলে ধরেছেন। কারণ এটাই নতুন কৌশল। ইংরেজিতে বলা হয় 'হোয়াট-অ্যাবাউটরি'। ইচ্ছে করে ধূপগুড়িতে তৃণমূলের জয়কে ইন্ডি-জোটের জয় বলেছেন মমতা। এতে মারাত্মক অসুবিধায় পড়েছে ক্ষয়িষ্ণু সিপিএম। মমতার সর্বনাশ কামনা না করে রাজ্যের বাম নেতারা প্রাতরাশ করেন না। সেই মমতা এখন তাদের জোট-বন্ধু?

বাম আর কংগ্রেসের কবর খুঁড়ছেন মমতা। লিখছেন সমাধি লিপি। মমতা এক ঢিলে দু'পাখি মারতে চান। চেনা শত্রু বিজেপিকে সরাসরি মোকাবিলা। পাশাপাশি দুর্নীতির ফাঁসে বাম আর কংগ্রেসকে জড়িয়ে তাদের দুর্নীতি-রথে তুলে নেওয়া। তাতে পাপ লঘু হবে বলেই তাঁর ধারণা। বিজেপি আর তৃণমূল— রাজ্যকে দু' দলে ভাগ করে ২০২৪-এর লোকসভা ভোট লড়তে চান মমতা। তাই বাম আর কংগ্রেস— দু'ই ফসিল পার্টিকে রাজ্য থেকে লোপ পাওয়াতে চান। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই নিজেকে বরাত দিয়েছেন। □

বিশ্বের দরবারে ভারতের জয়গান

তবু মোদী নিপাত যাক

বিদেশভ্রমণেষু দিদি,

‘ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।’

দিদি, এমনটা শুনেছি যে, বিদেশের মাটিতে থাকলে বেশি করে বোঝা যায় নিজের দেশের গরিমা। এই চিঠি যখন লিখছি তখন, আপনি দুবাই হয়ে স্পেনে। রাস্তাঘাটে, বৈঠকে একটু কান পেতে শুনবেন আপনাকে কিন্তু ভারতের রাজনীতিক বলেই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। এবং আপনি বিশেষ গুরুত্বও পাচ্ছেন। কারণ, গত কয়েক বছরে ভারতের নামটা বিশ্বের কাছে একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে। দেশের গুরুত্ব এখন অনেক উপরে।

কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত এখন বিশ্বগুরুর পদের প্রধান দাবিদার। বিনামূল্যে কিংবা সঠিক দামে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিকে কোভিডের ভ্যাকসিন সরবরাহ করবে কে? ভারত। বিশ্ব বাজারে খাদ্যশস্যের ঘাটতি তৈরি হলে তা মেটাবে কে? ভারত। আপনিও জানেন দিদি, এই যে নেতৃত্বের দাবি কোনও উটকো দাবি নয়। ভারত চিরকালই গুরুর পদে আসীন ছিল। এমনকী পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির প্রিয় গণতন্ত্র, তাও সনাতন ভারতেরই অবদান। এখন ভারতের অর্থনীতি যেখানে যেতে চলেছে তাও গোটা বিশ্বকে সমীহ করে দেখতে হচ্ছে।

আর সম্প্রতি শেষ হওয়া ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর সম্মেলনের পরে তো মানতেই হবে ভারত বিশ্বগুরু। ‘নয়া দিল্লির ঘোষণা’ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ হয়েছে। ছিল ক্ষীণ আশা, কিন্তু তা বাস্তব হয়েছে। এটা মানতেই হবে যে, আগে ভাবা হচ্ছিল, জি-২০ সম্মেলনে সমস্ত দেশের মধ্যে বোঝাপোড়া হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, বাস্তবে যা হলো তা আশাতীত। সদস্য দেশগুলিকে প্রতিটি ইস্যুতে এক সুরে বাঁধার প্রয়াসে ভারত সরকারের প্রশংসা করতেই হবে। ভারতের কূটনৈতিক চালের তারিফ করতে হবে। এমন একটি ফর্মুলা নেওয়া হয়েছিল যাতে এই দ্বন্দ্ব মুছে প্রতিটি দেশ একমত হতে পারে। এটি ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কূটনৈতিক জয়। কোনও সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত দেশ সমস্ত বিষয় নিয়ে একমত না হলে সেই সম্মেলনের কোনও অর্থ হয় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই জি-২০ সম্মেলন চূড়ান্ত ভাবে সফল হয়েছে। বিরোধীরাও এটা মানছেন দিদি। আপনিও নিশ্চয়ই। বিদেশে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে একটু জানতে পারেন তাঁরা কী বলছেন।

এছাড়া আরও অনেক উদ্যোগ ছিল। ৫৫ সদস্যের আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা, যা এখনও পর্যন্ত জি-২০-তে একটি রিজিওনাল গ্রুপিং হিসেবে শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত করার মতো ভারসাম্যহীনতার সংশোধন করেছে। গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল পৃথিবীতে বিকল্প শক্তির ব্যাপারে গবেষণা ও তাকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে। সব শেষে, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপের করিডোর, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ডিজিটাল ব্যবস্থা থেকে বিদেশ নীতি যা যা সমালোচনার অস্ত্র সব ভোঁতা করে দিয়েছেন মোদী। তাই এমন কিছু তুলে ধরতে হবে, যা ‘পরিবর্ত’ হিসেবে দৃশ্যতই উন্নততর। কিন্তু দিদি, সেই উন্নততর পরিবর্ত তুলে ধরার কাজটি মোটেই সহজ নয়।

মোদীর নেতৃত্বে জি-২০-কে বাঁধাধরা গতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ভারত। তাই এটিকে একটি মাত্র ভেন্যুর অনুষ্ঠানের বদলে দেশের ৬০টিরও বেশি শহরে ২০০টি সম্মেলনের আয়োজন করেছে। তাতে বিশ্বের ১২৫টি দেশের ১ লক্ষেরও বেশি প্রতিনিধি ভারতের মাটিতে পা রেখেছেন। ভারত পথ দেখিয়ে দিল। আগামী দিনে জি-২০ বৈঠক আয়োজনের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় কি না, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

দেশের রাজনীতির দিকে তাকিয়ে আপনি হয়তো ‘মোদী হঠাও’ স্লোগান তুলবেন দিদি। সেটাই উচিত। কিন্তু দিদি, এটা কি মানতে কোনও সমস্যা রয়েছে যে ভারতে তো বটেই বিশ্বেও মোদীর সমান জনপ্রিয়তা আর কারও রয়েছে? এই যে আপনারা জোট বানিয়েছেন তাতে এমন একজন রয়েছেন কি যাঁকে সামনে রেখে নির্বাচন লড়া যায়? যদি বিরোধীরা জয়ের আশা নিয়ে এগোতে চান, তা হলে নতুন জোটকে বর্তমান সরকারের সমালোচনার চেয়ে বেশি কিছু তুলে ধরতে হবে। কারণ, গত কয়েক বছরে ভারত বদলে গিয়েছে। ডিজিটাল ব্যবস্থা থেকে বিদেশ নীতি যা যা সমালোচনার অস্ত্র সব ভোঁতা করে দিয়েছেন মোদী। তাই এমন কিছু তুলে ধরতে হবে, যা ‘পরিবর্ত’ হিসেবে দৃশ্যতই উন্নততর। কিন্তু দিদি, সেই উন্নততর পরিবর্ত তুলে ধরার কাজটি মোটেই সহজ নয়।

আপনার অনুগত ভক্ত ও ভাই হিসেবে আমি মনে মনে বলি ‘দিদিই পারবেন’। মোদীর বিকল্প দিদিই। কিন্তু জোরে বলতে পারি না। গলা বুজে আসে। কারণ, আপনার দল যে গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। আজকাল সেইসব দুর্নীতির সর্বময় নেত্রী হিসেবে যাঁর নাম উঠে আসে তাঁকে যে আমি বড্ড ভালোবাসি দিদি। □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

ইন্ডিয়া না ভারত

বিতর্ক এই নামকরণের মতো তুচ্ছ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়

গত সপ্তাহে সূচিত ভারত ও ইন্ডিয়া নামকরণ বা নামবদল নিয়ে চুলচেরা বিতর্কের ভেতর রয়েছে প্রাচীন ‘endonym’ অর্থাৎ আমরা নিজেদের কী নাম পরিচয়ে অভিহিত করেছি আর ‘exonym’ অর্থাৎ অন্য লোকে আমাদের কী নামে ডাকা শুরু করল। দুটি বিষয়ই দেশের রাজনৈতিক অভিধানের অন্তর্গত। সহজ অর্থে ইংরেজি তকমাগুলির অর্থ জানিয়েছি। তবে আরও সহজ করে বললে ‘endonym’ আমাদের নিজেদের আরোপিত নাম আর ‘exonym’ বহিরাগত অর্থাৎ আমাদের সমাজ বা দেশবাসীর বাইরে অন্যের আরোপিত নাম। আমরা কি জানি না ভারত আমাদের জাতীয় সংগীতে কী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে? রবীন্দ্রনাথ এই গানটিকে কিছুটা সংস্কৃতগন্ধী বাংলায় লিখেছিলেন। কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার পড়ে না। ভারতের সবকটি প্রদেশের নিজস্ব ভাষাতেই দেশের অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম টাকার ওপর ‘ভারত’ কথাটিই মুদ্রিত আছে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া দ্বারা মুদ্রিত শব্দটি ‘exonym’, কিন্তু স্বাধীনতার পরের ৭৫ বছরের নিজস্ব স্বাধীনতা উপভোগের সময়ে বিশিষ্ট পরিচয়ের অধিকারী এক cosmopolitan শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে যাদের তরফে মূলধারার দেশবাসী অর্পিত endonym-এর স্থলে ওই বহিরাগতের দেওয়া তকমা exonym মেনে নিতে বলা হচ্ছে। এই বহিরাগত পরিচয়টিকেও ভালোবাসা এলিট জনগণও কিন্তু বাস্তবে সংখ্যালঘু। ইতিহাস বলছে, সংবিধান নির্মাণের সময় জওহরলাল নেহরু সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই ইংরেজ আরোপিত ইন্ডিয়া এবং ভারতের ইতিহাস আরোপিত ‘ভারত’ নিয়ে প্রয়োজনীয় পূর্ণ বিতর্ক পরিহার করে এক ঢিলে দুই পাখি মেরে ‘India that is Bharat’ সংবিধানে ঢুকিয়ে দেয়।

ঠিক ‘বন্দে মাতরম্’ যা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণা-সংগীত তাকে অনেক নীচে নামিয়ে খণ্ডিত করে ফেলা হয়। আর এটি সংসদের চেয়ার থেকে ঘোষিত হয়। ঠিক সেই ‘ভারত’ নামকে নেহাতই কথাবার্তা বলার জন্য নিতান্ত ব্যবহারিক ভাষায় অবনমন করা হয়। মহা গুরুত্বে ব্যবহৃত হতে থাকে ভারতের পরিচয় হিসেবে ইন্ডিয়া। এই নামই ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কায়দা করে ভারত নামের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা অব্যবহৃত হতে বলা বা করা হয়নি। কিন্তু ঠিক যেমন vernacular বা দেশের চিরপরিচিত ভাষা যার দ্বারা দেশের ভাষার উত্তরাধিকার চিহ্নিত করা হয় তাকে গুরুত্বহীন করা হয়। যাতে ‘ভারত’ একটি অতি প্রাচীন তুলনামূলকভাবে অব্যবহৃত শব্দ হয়ে পড়ে সেই ধরনের প্রচেষ্টারই অঙ্গ ‘India that is Bharat’।

ভারত ইন্ডিয়া বিতর্ক এখন কেবলমাত্র ক্ষুদ্র নাম নিয়ে বিরোধিতা নয়। এই বিরোধ এখন প্রমাণ করছে মোদী কীভাবে জনমানসে দেশ সম্পর্কে সংবেদনশীলতাকে আমূল ইতিবাচক করে তুলেছেন যার তুমুল প্রভাব ভারতকে ইন্ডিয়া হিসেবে জানা বিদেশি দেশগুলিও অনুভব করছে।

এই ধরনের আলোচনার প্রভাব যে কতটা তিক্ত অভিঘাত তৈরি করতে পারে এবং ভারত শব্দের দ্বিতীয় নাগরিকের Status যে কতটা সত্যি তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অতিথিদের উদ্দেশে প্রচারিত আমন্ত্রণপত্রে নিজের পরিচয় দিতে লিখলেন ‘President of Bharat’, মুহূর্তে ঘোষিত হয়ে গেল যে নরেন্দ্র মোদী সরকার দেশের নাম পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এই ধরনের দুরভিসন্ধিপূর্ণ দাবি সম্পূর্ণ অন্যায়। কেননা সংবিধানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখা আছে ‘ভারত কিংবা ইন্ডিয়া’ যা কিছু অক্লেশে ব্যবহার হতে পারে। এ অধিকার সরকারের অবিতর্কিত। এই নামের একই কিন্তু ভিন্ন প্রয়োগ সেই নিজমান্য এলিট সম্প্রদায়কে তাদের গোপন বিশ্বাস থেকে খেপিয়ে তুলল যে পাশ্চাত্যগন্ধী ইন্ডিয়া নামটি সর্বদা ব্যবহার করাই সদা কর্তব্য, বিশেষ করে যখন বিশ্ব সম্প্রদায় (global Community)-এর কাছে দেশকে পরিচিত করানো হবে। আর ‘ভারত’ নামটি কেবলমাত্র ২২টি ভাষায় (ইংরেজি ছাড়া) যা সংবিধানে আছে তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান প্রদান হতে পারে অর্থাৎ দেশীয়।

এই সূত্রে একথা নিশ্চয় সত্য যে সংবিধান দেশের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া ও ভারত দুটিকেই সমান অবস্থান দিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে জটিলতা

নিশ্চিতভাবে রয়েছে। এটা ধরা যেতে পারে দুটি শব্দের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তিত ব্যবহারকে যদি সত্যি বলে মানা হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ভারত কথাটির জি-২০ সম্মেলনের ক্ষেত্রে ব্যবহার এত বেশি বিতর্কিত শোরগোল সৃষ্টি করত না। মোদী বিরোধীদের চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রমাণ করল যে 'ইন্ডিয়া' আত্মপরিচয়মূলক শব্দটির সামাজিক ভাবে 'ভারত' শব্দটির ওপর আধিপত্য ও বাড়তি অধিকার রয়েছে। সামাজিক পরিচয়ে অর্থাৎ সেই elitism বা বিশিষ্টবোধে ভারতের থেকে ইন্ডিয়া এগিয়ে। এই বিরোধীদের আচরণ দেখে মনে হয় তাঁরা তাঁদের ব্যবহারের ও চিন্তাধারার পথটি বেছে নিয়েছিলেন নেহরুর কাছ থেকে। নেহরু ভাবতেন ভারতের অতীতের উপস্থিতিই ইন্ডিয়ার অগ্রসর হয়ে আধুনিক হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টিকারী। ১৯৫৫ সালে চণ্ডীগড়ে পঞ্জাব উচ্চ আদালতের নির্মিত সদন উন্মোচন করতে গিয়ে তিনি একেবারে চরম ভঙ্গীতে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসে ঘোষণা করেছিলেন, 'I am very happy that people of Punjab did not make the mistake of making old city as their new capital...' বাকি অংশটি বাংলায় অনুবাদে 'যদি তোমরা প্রাচীন শহরকে রাজধানী হিসেবে বেছে নিতে তাহলে পঞ্জাব একটি মানসিকভাবে স্তিমিত, পিছিয়ে পড়া রাজ্য হয়ে উঠত। রাজ্যের কিছু প্রগতিশীল নাগরিকের চেষ্টায়, বহু কসরতে হয়তো কিছুটা প্রগতি করতে পারত কিন্তু বড়ো ধরনের উন্নতি কিছুতেই হতো না।' নেহরুর ভারতের একান্ত বস্তুগুলি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা উলটো দিকে পাশ্চাত্যের সৌন্দর্যবোধের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ এই বক্তব্যের মধ্যে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। তাঁকে দুটি দেশ নির্ণায়ক শব্দের মধ্যে বেছে নিতে বললে তিনি সম্ভবত ভারতকে বাছতেন না। এত পুরনো ছাড়াও চালু বিতর্ক নিয়ে আরও সমসাময়িক উদাহরণও আছে। যারা ভারতকে কেবলমাত্র তিন অক্ষরের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দ ছাড়া আরও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মনে করেন তাদের জন্য মোদী বিষ্ণুপুরাণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি সংসদে বিতর্ক চলাকালীন দিয়েছিলেন।

তাঁর বক্তব্যে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল অঞ্চল থেকে জাতীয়তার সম্পর্কের রূপরেখা। 'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্, বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ'। অর্থাৎ 'সেই দেশ যেটি সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থান করছে, তারই নাম ভারত। আর তাঁর সন্তানদের বলা হয় ভারতী বা ভারতীয়'।

ভারতের জাতীয়ত্বের প্রাচীনতা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাধাকুমুদ মুখার্জি এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নামের সততা বহুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, কিন্তু আজকের তারিখেও দাক্ষিণাত্য থেকে সনাতন ভারত এবং তাঁর ব্যবহারিক চরিত্র নিয়ে ঘৃণ্য বক্তব্য সব কিছু অস্বীকার করছে। ভারত ইন্ডিয়া বিতর্ক এখন কেবলমাত্র ক্ষুদ্র নাম নিয়ে বিরোধিতা নয়। এই বিরোধ এখন প্রমাণ করছে মোদী কীভাবে জনমানসে দেশ সম্পর্কে সংবেদনশীলতাকে আমূল ইতিবাচক করে তুলেছেন যার তুমুল প্রভাব ভারতকে ইন্ডিয়া হিসেবে জানা বিদেশি দেশগুলিও অনুভব করছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক ও রাজ্যসভার সদস্য)

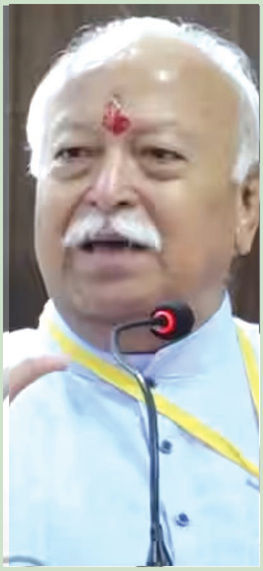

"যুগযুগান্তর ধরে আমাদের দেশের নাম ভারত। যে কোনো ভারতীয় ভাষাতেই এই নামটি এক ও অদ্বিতীয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশ ভারত। সব ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়া' শব্দের ব্যবহার পরিহার করে সকল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'ভারত' শব্দটি ব্যবহার শুরু করলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কর্তব্য 'ইন্ডিয়া' শব্দের ব্যবহার থেকে বিরত থেকে দেশের নাম 'ভারত' বলে উল্লেখ করা এবং অন্যদেরও এই বিষয়ে সচেতন করা"

—মোহনরাও ভাগবত

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি জেলার পূর্বতন জেলা সঙ্ঘচালক তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সত্যপদ পাল গত ৫ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। জেলা সঙ্ঘচালকের দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি বিদ্যাভারতী, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম-সহ বহু সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

* * *

হাওড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জী দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৮ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ১ পুত্র ও ২ নাতিকে রেখে যান। কেশব চন্দ্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা সমিতি পরিচালিত চিকিৎসাকেন্দ্রে তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

শিবাজীর বাঘনখ ফিরে পাচ্ছে ভারত

জি-২০ সম্মেলনের সফল আয়োজনের মধ্যেই মোদী-সরকারের বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরতে চলেছে শিবাজী মহারাজের ঐতিহাসিক 'বাঘনখ'। বাঘের নখের মতো দেখতে যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ১৬৫৯ সালের ১০ নভেম্বর বীজাপুর সুলতানি সাম্রাজ্যের মুঘল সেনাপতি আফজল খানকে হত্যা করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক কারণ লুকিয়ে আছে? শিবাজীর উপর লেখা যদুনাথ সরকারের বই 'শিবাজী অ্যান্ড হিজ টাইমস' অনুসারে, বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ শিবাজীকে হত্যা করার জন্য আফজল খানকে পাঠিয়েছিলেন। শিবাজী তাঁর দুই অনুচরকে নিয়ে এই সভায় আসেন। আফজল খানও পাঁচ অনুগতকে নিয়ে সেখানে যান। আফজল খানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিবাজী ইতিমধ্যেই ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন। আফজল খান আলিঙ্গন করার সুযোগে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন, যদিও শিবাজী এমন সম্ভাব্য আক্রমণের আঁচ পেয়েই আফজল শিবাজীকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী তাঁর বিশেষ অস্ত্র বাঘনখ বের করে আফজল খানকে হত্যা করেন।

আসলে বাঘনখ হলো ইস্পাতের তৈরি মারাত্মক ধারালো অস্ত্রবিশেষ। এটা মূলত হাতের মুঠোর মাপের হয়। এটির দু'পাশেই একটি করে আংটা রয়েছে যা হাতের প্রথম এবং চতুর্থ আঙুলে পরা হয়। ঐতিহাসিকদের মতো, শিবাজী সর্বদা এই বিশেষ অস্ত্রটি তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিজের সঙ্গে রাখতেন। পরবর্তীকালে সাতারায় মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর উত্তরাধিকারীদের কাছে 'বাঘনখ' ছিল। পরে সেটি সাতারার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তা জেমস গ্রান্ট ডাফের হাতে তুলে দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের শাসক যাদের পেশোয়া বলা হতো। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত সাতারা কোর্টে কর্মরত ছিলেন ডাফ। তারপর নিজের সঙ্গে 'বাঘনখ' নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। পরে ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের হাতে সেই ঐতিহাসিক অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন ডাফের উত্তরাধিকারী। আপাতত লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সেটি প্রদর্শিত হয়। সেখান থেকে ভারত ঐতিহাসিক 'বাঘনখ' ফিরিয়ে আনার জন্য শীঘ্রই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর সেক্ষেত্রে এবছরের মধ্যেই নিজের 'দেশে' ফিরে আসবে 'বাঘনখ'। বিষয়টি নিয়ে মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী সুধীর মুঙ্গান্তিওয়ার জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের সরকারি তরফে একটি চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের 'বাঘনখ' ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আফজল খানকে হত্যার বর্ষপূর্তিতে সেটা হাতে পেতে পারে মহারাষ্ট্র সরকার। আরও কয়েকটি সম্ভাব্য দিনক্ষণ নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। কোন পথে ভারতে 'বাঘনখ' ফিরিয়ে আনা হবে, তা নিয়েও আলোচনা চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, বাঘনখ ফিরিয়ে আনার জন্য চলতি মাসেই ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের সঙ্গে স্বাক্ষর করার জন্য লন্ডন যেতে পারেন সুধীর মুঙ্গান্তিওয়ার।

কীভাবে শিবাজী সেই 'বাঘনখ' ব্যবহার করতেন, সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য, তিনি আঙুলের গাঁটে 'বাঘনখ' পরে থাকতেন। এমনভাবে সেই ধারালো ছোরা তৈরি করা হয়েছিল যে আঙুলের গাঁটে পরে থাকা যেত। হাতের তালুর নীচে এমনভাবে 'বাঘনখ' থাকত যে কেউ টেরও পেতেন না যে মহারাজ শিবাজীর হাতে কোনও অস্ত্র আছে। কিন্তু যখন ঘুষি চালাতেন মহারাজ শিবাজী, তখন ফালাফালা হয়ে যেত শত্রু। এই অস্ত্রে চারটি ধারালো 'মুখ' আছে। আর সেই ঐতিহাসিক অস্ত্রের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের মানুষের আবেগ জড়িত আছে। ভারতীয় স্বাভিমানবোধের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হলো ছত্রপতি শিবাজীর 'বাঘনখ'। বিষয়টির সঙ্গে মারাঠা আবেগও জড়িয়ে আছে। তাই শিবাজী মহারাজের 'বাঘনখ' ফিরে আসার বিষয়টি মহারাষ্ট্রের মানুষের জন্য তো বটেই, ভারতবাসীর কাছেও বিরাট প্রাপ্তি।

মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ঐতিহাসিক 'বাঘনখ' ফেরানোর জন্য ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের ফাঁকে ব্রিটেনের হাতে এখনো রয়ে যাওয়া ছত্রপতি শিবাজীর অন্যান্য ঐতিহাসিক সামগ্রী ফিরিয়ে আনার বিষয়েও আলোচনা চালানো হবে। প্রকাশ্যে না হলেও কূটনীতিজ্ঞরা মনে করছেন, ইতিমধ্যেই বিদেশে ভারতের হৃত যত ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে, তা ফিরিয়ে আনতে মোদী-সরকার যেভাবে উদ্যোগী হয়েছে, শিবাজী মহারাজের বাঘনখ ফিরিয়ে আনতেও ভারত সরকারের উদ্যোগেই ফলপ্রসূ হয়েছে। নয়াদিল্লিতে চলা জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফরে আসেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায় শিবাজীর ব্যবহৃত ঐতিহাসিক নিদর্শন ফেরানো নিয়ে জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সুনক অবশ্য এই নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

জি-২০ সম্মেলন চলাকালীনই প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ঋষি। সূত্রের খবর, সেখানে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা হয়েছে। আর এখানেই কূটনৈতিক-মহল মনে করছেন, শিবাজীর বাঘনখ ফেরানো নিয়ে কথা হয়ে থাকলেও থাকতে পারে। যদিও সরকারিভাবে দু'দেশের তরফ থেকে কিছুই জানানো হয়নি। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের অজুহাতে ভারত থেকে চুরি হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ফেরাতে মোদী সরকার যেভাবে নিকট অতীতে ব্যগ্রতা দেখিয়েছে, ভারতে বাঘনখ ফেরানোও তার ব্যতিক্রম নয় বলেই কূটনৈতিক মহলের বিশ্বাস। □

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের ইতিহাস ও বর্তমান কর্তব্য

মোহিত রায়

পশ্চিমবঙ্গ দিবস এখন আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে কী পশ্চিমবঙ্গবাসী, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন জানতই না যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের যেমন বিহার, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের আলাদা রাজ্য দিবস রয়েছে। মহারাষ্ট্রে ১ মে, কর্ণাটকে ১ নভেম্বর, পাশের রাজ্য বিহারে ২২ মার্চ, ওড়িশায় ১ এপ্রিল রাজ্য দিবস পালিত হয়। এই সব রাজ্যে এই দিবসগুলি উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। গত কয়েক বছরে ছবিটা পালটাচ্ছে, ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে। এখন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই দিনটিকে নিয়ে বিশেষ চিন্তায় পড়েছে। ২০ জুনকে ভুলিয়ে দিতে তারা বিধানসভায় প্রস্তাব এনে সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সভা করে একটি নতুন দিন আবিষ্কারের পথে রয়েছে। ইসলামি কট্টরবাদীদের সহযোগী তৃণমূল দল পশ্চিমবঙ্গ নামটিই মুছে ফেলতে চায়, ফলে বাংলা দিবসের খোঁজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ইতিহাসকে বিকৃত করার মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনে সমর্থন করেছে পশ্চিমবঙ্গের পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও অন্যান্যরা। ফলে এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য এবং কীভাবে এই দিবস পালন শুরু হলো তা জানাটাও প্রয়োজনীয় হতে পারে।

বছর দশেক হলো ‘পশ্চিমবঙ্গের জন্য’ নামক একটি চিন্তাগোষ্ঠী বাঙ্গালি হিন্দুর পরিচয়কে বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক কাজ করে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য চিন্তাগোষ্ঠী এই প্রতিবেদকের নেতৃত্বে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপনের কাজটি শুরু করে। ২০১২-১৩-তে ঘরোয়াভাবে দিনটি পালিত হয়। প্রথম প্রকাশ্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয় ২০১৪ সালের ২০ জুন কলেজস্কোয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে। সন্ধ্যায় আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন লেখিকা এষা দে, অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক তথাগত রায় এবং এই প্রতেবেদক। সেই শুরু।

পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি নিয়ে এক ধরনের লজ্জায় ভোগে বাঙ্গালি সেকুলাররা। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ইতিহাস, সংস্কৃতি, সংবাদে এমন ধারণাই বাঙ্গালির মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ১৯৪৭-এর বঙ্গ ভাগ এক বড়ো অন্যায়। তাদের মত হলো ওসব ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি দাঙ্গার ইতিহাস ভুলে থাকাই ভালো, এখন আমরা সবাই একই বৃন্তে দুটি কুসুম। ‘পশ্চিমবঙ্গের জন্য’ চিন্তাগোষ্ঠী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া শুরু করে যে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গ শুধু একটি ভৌগোলিক অবস্থান নয়, এটি বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার একটি ভাবনা। ১৯৪৭-এ এলো ভারতবর্ষ ভাগের পর্ব। যুক্ত বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৫ শতাংশ মুসলমান চেয়েছিলেন বঙ্গের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগদান। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া কলকাতার বীভৎস দাঙ্গা, তারপর নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যার পর কেউ মুসলমান শাসিত বঙ্গে থাকার কথা ভাবতেই পারেননি। এই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির জন্য এগিয়ে এলেন বঙ্গের মনীষীরা--- ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, মতুয়া গুরু প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, পরবর্তী সময়ে বঙ্গের কংগ্রেস দল। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরি হলো পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। দুই আইনসভাতেই অমুসলমান সদস্যরা বঙ্গভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দেন। শ্যামাপ্রসাদ

> **পশ্চিমবঙ্গের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটিকে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল বা সংগঠনগুলি তাদের কর্মসূচি হিসেবে ঘোষণা করেনি। তাঁরা নমোনমো করে কখনো একটা অনুষ্ঠান করেন, ব্যস।**

ফঃ ২

মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০ জুনই পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়ে গেল। হিন্দু বাঙ্গালি তাঁর নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ স্থাপন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি অমুসলমান বহুত্ববাদী বাঙ্গালিদের নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য যা ইসলামি পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশে সম্ভব নয়।

হিন্দুদের দাবি যে সম্পূর্ণ সঠিক তা প্রমাণিত পূর্ব পকিস্তানে ও পরিবর্তী বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ নেমে আসায়। গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও এখন তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামি কট্টরবাদের তোষণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুরু

২০১৪-তে শুরু হওয়া পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ২০১৫ সালে দিনটি পালিত হয় হাবড়া পুরসভার সভাগৃহে। ২০১৬ সালে ২০ জুন একটি আলোচনা চক্র আয়োজিত হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে। ইতিমধ্যে এই প্রতিবেদক রাজ্য বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের আহ্বায়ক হন এবং ২০১৭ সাল থেকে বিজেপি উদ্বাস্তু সেল পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন শুরু করে। এর ফলে বিষয়টি হিন্দুত্ববাদী মহলে প্রসারিত হতে শুরু করে। প্রতি বছর বিজেপি রাজ্য অফিসের সামনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন শুরু হয় এবং বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের অনেকেই সেইসব সভায় যোগ দেন ও বক্তব্য রাখেন। ২০১৯ সালে টিভিতে এই বিষয়ে আলোচনায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বক্তব্য রাখেন। ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় কুড়িটি স্থানে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়। সোনারপুরে এই দিবসের নামে একটি কমিটি প্রতি বছর অনুষ্ঠান করে। ২০২০ সালে বিজেপি বিধায়ক দুলাল বর বিধানসভা অধ্যক্ষকে এই দিবসটি বিধানসভায় পালনের জন্য আবেদন করেন। এটিই পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিধায়কের ২০ জুন পালনের জন্য অধ্যক্ষকে প্রথম পত্র।

২০২১-এর ২০ জুনে বিজেপি অফিসের সামনে উদ্বাস্তু সেলের জনসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও এই প্রতিবেদক ভাষণ দেন। তারপর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পঁচিশজন বিধায়ক বিধানসভার গেটের সামনে পথসভা করেন। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির সূচনা হয় সেখানে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হলো। ২০২২ সালে কলকাতা ময়দানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি সংলগ্ন উদ্যানে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয়। এর জন্য অনুষ্ঠানস্থলটির অনুমতি নিয়েছিল মুকুন্দপুর ভারতমাতা সেবা সমিতি। ওইদিন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভার অধ্যক্ষকে ২০ জুন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নথি পত্র পেশ ও দিনটি পালনের দাবি জানান। অধ্যক্ষ এই দাবি নামঞ্জুর করলে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের বেশি বিধায়ক শোভাযাত্রা করে বিধানসভা থেকে ময়দানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি সংলগ্ন উদ্যানে উপস্থিত হয়ে দিবসটি পালন করেন। ২০২৩-এর ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস একইভাবে পালিত হয়। পালিত হয় কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে।

এর ফলে সেকুলার মহল চিন্তিত হয়ে ওঠে। এই লুকিয়ে রাখা ইতিহাস প্রকাশ্যে আসায় বাঙ্গালি হিন্দু আবার শ্যামাপ্রসাদের মহান ভূমিকা নিয়ে সচেতন হচ্ছে, বুঝতে পারছে পশ্চিমবঙ্গ গঠন কী ভয়ংকর ইসলামি বিভীষিকা থেকে হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচিয়েছে।

তবে অনুতাপের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটিকে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল বা সংগঠনগুলি তাদের কর্মসূচি হিসেবে ঘোষণা করেনি। তাঁরা নমোনমো করে কখনো একটা অনুষ্ঠান করেন, ব্যস। তাদের দলের সংগঠনগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের কোনো ঘোষণা করেননি। সম্ভবত তাঁরা দিল্লির দিকে তাকিয়ে আছেন।

তবে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস মানুষের নজর কেড়েছে এবং সেকুলাররা এর বিরোধিতায় নেমেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় এই দিবস পালন এক হাতিয়ার হয়ে উঠবে। এই দিবস পালনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে জানানো যাবে হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ইসলামি কট্টরবাদের বিপদ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে এই কর্মকাণ্ড একান্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ মানে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড, হিন্দুর নিরাপদ অস্তিত্ব, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও নারীর নিরাপত্তা। আমাদের কাজ হোক :

- স্বাধীনতা দিবসের মতো প্রতিটি মণ্ডলে, জেলায়, সাংস্কৃতিক সংগঠনে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পালিত হোক।
- শুধু ঘরের মধ্যে আলোচনা সভা নয়; উন্মুক্ত স্থানে, পথে, মাঠে, বাজারে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে হবে। এতে মানুষ জানতে চাইবে এই নতুন দিবস কী ও কেন। শুধু ঘরের মধ্যে পালনে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।
- প্রতি বছর এই দিনটি বিধানসভায় মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হোক। বিধানসভা প্রাঙ্গণে একটি স্মারক স্থাপন করতে হবে।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

উৎসব নয়, ইতিহাস চাই

শিলাদিত্য ঘোষ

ভারতে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেরই একটা রাজ্য দিবস আছে। নেই শুধু পশ্চিমবঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজ্য দিবস নেই কেন? আমাদের রাজ্যের কি কোনও ইতিহাস নেই? নাকি আমরা বিস্মৃত? আসলে ভারতীয় তথা বাঙ্গলার ইতিহাস তথা সংস্কৃতি নিয়ে কোনওকালেই আগ্রহ ছিল না কমিউনিস্টদের। তাঁরা পয়লা মে নিয়ে যত চিন্তিত ছিলেন ততটা পয়লা বৈশাখ নিয়ে নয়। তারও আগে কংগ্রেস নেহরু তথা গান্ধী পরিবার ছাড়া কিছুই ভাবতে পারেনি, পারে না। ফলে বাঙ্গলার সঙ্গে গান্ধীদের যোগাযোগের তেমন দিন খুঁজে পায়নি। আবার তৃণমূলের কাছে নীতির কোনও বালাই নেই। রাজ্যের প্রকল্পের নাম যারা 'খেলা হবে' রাখতে পারে তাদের কাছে আর কীই-বা আশা করা যেতে পারে। তাই একটা তারিখ পেলেই হলো। ইতিহাস চাই না। উৎসব চাই মনোভাব নিয়েই যত চিন্তা। মুখ্যমন্ত্রী আবার এক বড়ো নীতিতে বিশ্বাস করেন। সেটা হলো নিজের সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তাই তো পশ্চিমবঙ্গ দিবস খুঁজতে তিনি বেছে বেছে মেরুদণ্ডহীন, মোসায়েবদের ডেকে একটা বৈঠক করে ফেললেন। সেখানে বেশির ভাগেরই উত্তর ছিল—'দিদি, আপনি যা ভালো করবেন তাই হবে।' পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বজন ও জমি হারানোর অনেক কষ্ট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আসা মানুষদের আবেগ নিয়ে যে ক্লাব চলে সেই ইস্টবেঙ্গলের কর্তারাও বললেন, 'দিদি আপনার কথাই চলবে।' আসলে ক্লাব সমর্থকদের আবেগ নয়, দিদির অনুদানেই বেশি নজর দুর্নীতিপরায়ণ ক্লাব কর্তাদের। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে সবাই যে দিদির 'হ্যাঁ'-তে হ্যাঁ মিলিয়েছেন তা নয়। কেউ কেউ মৃদু স্বরে অন্য তারিখের কথাও বলেছেন। তবে শেষে এটাও বলেছেন যে, তবে আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করুন। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে সাহিত্যিক থেকে সাংবাদিক কে ছিলেন না? তবে সেই বিবিধের মাঝে একটা ঐক্য দেখা গিয়েছে। সকলেই বলেছেন, আর যবেই হোক ২০ জুন কোনও ভাবে রাজ্য দিবস হতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না?

আসলে সত্যিই আমরা এক ইতিহাস বিস্মৃত জাতি। আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারতে অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ, দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা রাজ্য। তাতে কী হয়েছে? গরিবের কি জন্মদিন থাকতে পারে না? ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সাধারণ রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিনটিকেই রাজ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মহারাষ্ট্রে যেমন ১ মে, কর্ণাটকে ১ নভেম্বর, রাজস্থানে ৩০ মার্চ পালিত হয়।

> রাজ্যের মানুষ মানুন না মানুন তৃণমূল পয়লা বৈশাখকেই রাজ্য দিবস বানাবে। অন্তত আগামী পয়লা বৈশাখ পালিত হবে। কারণ, লোকসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ডুবে থাকা তৃণমূলের হাতে কোনও কিছু বিষয় নেই। তাই বাঙ্গালি আবেগ নিয়েই 'খেলা হবে' নীতি।

গুজরাটে যেমন মহারাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যে দিনটাই আলাদা রাজ্যের স্বীকৃতি মিলেছিল সেই দিনটাই রাজ্য দিবস।

এখন প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবসটি কবে করা যায়? ব্রিটিশ শাসনকালের শেষ দিকে হয়েছিল দেশভাগ। যাওয়ার আগে দুর্বল করে দেওয়ার শেষ অস্ত্র। যে ক্ষত আজও রয়ে গিয়েছে ভারতের। সেই দেশভাগ ছিল এক অনভিপ্রেত অনিবার্য পরিণতি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশরা জাতীয়তাবোধ বিমুখ মুসলমান সমাজকে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। তার জন্য অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাও দিতে থাকে। মুসলমানদের জন্য এক পৃথক প্রদেশের পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯০৫ সালে। আর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। সেটাই বঙ্গপ্রদেশে বড়ো আকারে কট্টরবাদের জন্ম দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ওয়াহাবি মানসিকতা ফিরে আসে মুসলমান নেতৃত্বের মধ্য।

খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রকৃত প্যান-ইসলামি স্বরূপ সামনে আসে। স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামি দেশের দাবি উঠতে শুরু করে। মুসলিম লিগ যখন পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে, জাতীয় নেতৃত্ব তখন তাকে 'ফ্যান্টাস্টিক নন্‌সেন্স' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের দাবিতে কলকাতার রাস্তায় হিন্দুর রক্তে হোলি খেলার পর নোয়াখালিতে হিন্দুদের সার্বিক গণহত্যা। ক্ষমতালোভী জাতীয় নেতৃত্ব পাকিস্তানের দাবি তখনই মেনে নেয়। মুসলমান নেতৃত্ব গোটা বঙ্গের পাকিস্তানভুক্তির দাবি জানায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা সেই দাবি মানতে রাজি ছিলেন না। সেই দাবি তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। পশ্চিমবঙ্গের অমুসলমানদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নামে এক নতুন রাজ্যের প্রস্তাব দেন জাতীয়তাবাদীরা। স্পষ্ট করেই বলা হয়

পশ্চিমবঙ্গ নামের প্রদেশ পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবে। যে যুক্তিতে মাত্র ২৪ শতাংশ মুসলমান ভারতে থাকতে চাইছেন না, সেই একই যুক্তিতে তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের ৪৫ শতাংশ অমুসলমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইবেন কেন? এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

সেও এক সর্বাত্মক আন্দোলন ছিল। সেই আন্দোলনের প্রভাবে ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় বাধ্য হয়। আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে বিষয়টার মীমাংসার সিদ্ধান্ত হয়। এবার জানা যাক কী হয়েছিল ২০ জুন। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভার অমুসলমান সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পশ্চিমবঙ্গের দাবি সুনিশ্চিত হয়। তখনই প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল মন্ত্রীসভা গঠিত হয়ে যায়। অমুসলমান আমলারা সুরাবর্দির পরিবর্তে প্রফুল্ল সেনকেই রিপোর্ট করতে শুরু করেন। জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গের।

এটাই ইতিহাস যে, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদে (অবিভক্ত বঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভা) অখণ্ড বঙ্গ ভাগের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। বঙ্গভাগের পক্ষে বড়ো অংশের ভোট পড়ায় দু' টুকরো হয় বঙ্গপ্রদেশ। এই ভোটাভুটির ফলাফলের ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হয়, পূর্ববঙ্গ (যদিও প্রথমে তা পূর্বপাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ হয়) যুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। এই বঙ্গ ভাগের দু' মাসের মাথায় ইংরেজদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় ভারত। ২০ জুনের সেই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের দাবি।

আজ এটা মানতে হবেই যে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সংকট। যে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা এককালে দেশভাগ করে পাকিস্তান গঠন করেছিল, সেই একই চিন্তাধারা আজ বকলমে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। ১৯৪০-এর দশকে শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ইসলামি দেশের যে বীজ বপন করা হয়েছিল, আজ পশ্চিমবঙ্গে সেই বীজ পুনরায় রোপিত হচ্ছে। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে যে নোয়াখালির পুনরাবৃত্তি হবে না তা কে বলতে পারে? কারণ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃতের তালিকা, গোলমাল পাকানোর মাথা এবং সম্প্রতি বিভিন্ন বোমা কারখানায় বিস্ফোরণে কাদের নাম আসছে সেটা দেখা দরকার। মাথায় রাখা দরকার।

> **পয়লা বৈশাখ কি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস? হতে পারে অনেক আচার, রীতি জড়িয়ে রয়েছে ওই দিনটায়। কিন্তু সেটা তো বাংলা বর্ষ শুরুর হিসাবে। আরও একটা বিষয় যে, সেই পয়লা বৈশাখ বা বঙ্গাব্দ কিন্তু অখণ্ড বাঙ্গলার ছিল। তবে সেটা কী করে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা করে রাজ্য দিবস হতে পারে?**

রাজ্যের মানুষ মানুন না মানুন তৃণমূল পয়লা বৈশাখকেই রাজ্য দিবস বানাবে। অন্তত আগামী পয়লা বৈশাখ পালিত হবে। কারণ, লোকসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ডুবে থাকা তৃণমূলের হাতে কোনও কিছু বিষয় নেই। তাই বাঙ্গালি আবেগ নিয়েই 'খেলা হবে' নীতি।

কিন্তু পয়লা বৈশাখ কি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস? হতে পারে অনেক আচার, রীতি জড়িয়ে রয়েছে ওই দিনটায়। কিন্তু সেটা তো বাংলা বর্ষ শুরুর হিসাবে। আরও একটা বিষয় যে, সেই পয়লা বৈশাখ বা বঙ্গাব্দ কিন্তু অখণ্ড বাঙ্গলার ছিল। তবে সেটা কী করে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা করে রাজ্য দিবস হতে পারে?

অনেকে এমনটাও বলছেন যে, ২০ জুন তারিখটায় বাঙ্গলা ভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সেই দুঃখের দিনটা কেন পালন করা হবে? তাহলে তো বলতে হয় ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালনও ঠিক নয়। কারণ, তার সঙ্গে দেশভাগের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। আমার তো মনে হয়, দেশভাগের যন্ত্রণা মনে রাখার জন্যই বেশি করে স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত। ঠিক একই কারণে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস। আর একটা কারণ, বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য বাসযোগ্য ভূমি পাওয়ার অধিকারের দিন। কিন্তু সেটা বলা তো সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবে। এমনকী রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে 'বাঙ্গালি' লিখেছিলেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর রাগ। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক এবং অনন্য একটি গানের কথার সামান্য বদলও তাঁর প্রতি ভয়ানক অমর্যাদার পরিচায়ক। সুতরাং বাংলা ও বাঙ্গালির আত্মমর্যাদার পক্ষেও চরম হানিকর। মুখ্যমন্ত্রী খোদার উপরে খোদকারি করে সেই শব্দ বদলাতে চান। যাতে অবাঙ্গালি ভোট নষ্ট না হয়ে যায়। তাঁর যুক্তি, 'বাঙ্গালির প্রাণ বাঙ্গালির মন' বললে বঙ্গের সব মানুষকে বোঝায় না, তাই 'বাংলার প্রাণ বাংলার মন' গাওয়া শ্রেয়। কথাটি মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পারিষদবর্গ সেই প্রস্তাবে লালঝোল ফেলে সায় দিয়েছেন। বিচার-বুদ্ধি কিছুই কি নেই তাঁদের?

ভোটের কথা ভেবেই মুখ্যমন্ত্রী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে মানতে করতে চান না। তাতে মুসলমান ভোটের চেয়ে বেশি করে মুসলমান পেশিশক্তি দূরে চলে যাবে। এই একই কারণে এই রাজ্যে বোমার কারখানা চলে, বিশেষ বিশেষ এলাকায় সব আইনেই বিশেষ সম্প্রদায় ছাড় পেয়ে যায়।

সুতরাং, বাঙ্গালির দুর্দিনের আর অপেক্ষা নেই। তা সমাগত। না জানি আবার বাঙ্গালিকে তল্পিতল্পা নিয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে যেতে হবে না কি! রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটাই অক্ষত অবস্থায় বাঙ্গালির স্মরণ করা উচিত। ওই ঐতিহাসিক গানটাই বাঙ্গলার ইতিহাসকে বাঁচাতে পারবে। ☐

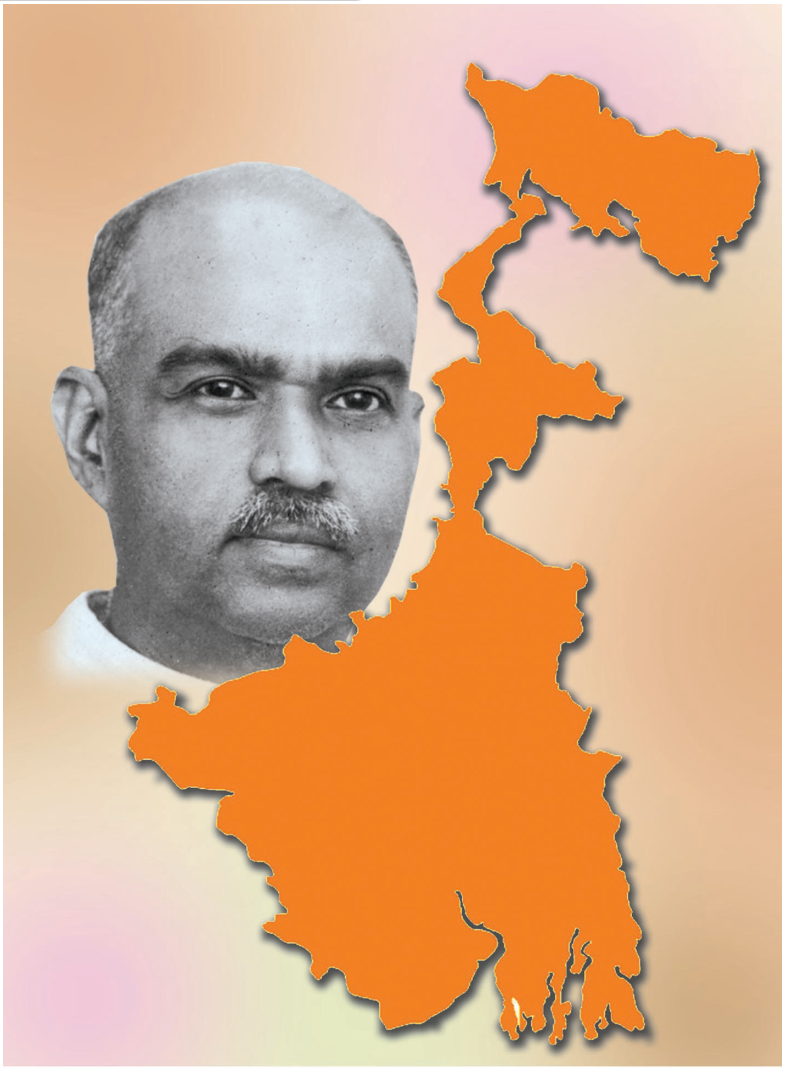

বঙ্গভূমিতে শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব মহাকালীর প্রলয় নৃত্যের মতো। হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচানোর জন্য; সারা দেশে 'এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান' করবার নেতৃত্ব দিয়ে খেসারত দিলেন তিনি। জীবন বলিদান দিলেন।

বিশে জুন হিন্দুদের জন্য একটি হোমল্যান্ড আদায় করার রোমহর্ষক দিন

কল্যাণ গৌতম

'খেলতে' ও 'খেলাতে' নামার আগে সবাইকে জানিয়ে রাখা ভালো, বাঙ্গালির আবেগ ১লা বৈশাখ নিয়ে অবশ্যই আছে। হ্যাঁ, ওইদিন বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শশাঙ্ককে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। ১লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস নয়।' এই দিনে অখণ্ড বঙ্গ ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ গড়ে ওঠবার পিছনে হিন্দু বাঙ্গালির একটা গভীর দুঃখ, বেদনা আছে। বেদনার মধ্যে বাঁচার একটা আলোও আছে। সেই আলো হিন্দু বাঙ্গালির কাছে জ্বলে উঠেছিল ২০ জুন। তবে আপনি ১লা বৈশাখ পালন করতে চান? করুন। বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা শশাঙ্ককে স্মরণ-মনন করতে কেউ আপনাকে বারণ করেননি! কেউ ১লা বৈশাখে হিন্দুরাজা তথা মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী বাঙ্গালির হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কারিগর প্রতাপাদিত্যকে স্মরণ করতে বারণ করেননি। কিন্তু ১লা বৈশাখ কোনোমতেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস হতে পারে না। বাঙ্গালি তার বিষাদের দিনগুলি ভুলে গেলে আবারও কঠিন মূল্য তাকে চোকাতে হবে। আপনার 'শান্তিবর্ষণকারী' প্রতিবেশী চায় না, তাদের ঠ্যাঙানি আপনি মনে রেখে সতর্ক থাকুন। 'ভালোর মুখোশপরা' আমাদের শাসকও তা চান না।

২০ জুনই পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস। অন্য কোনো দিন নয়, হতেও পারে না। যারা এই দিনটির বদল চাইছেন, তারা আসলে বাঙ্গালি হিন্দুর নির্যাতনের চিরকালীন ইতিহাসকে আড়াল করতে চাইছেন। তারাই আসলে বাঙ্গালির শত্রু।

বাঙ্গালি হিন্দুর বিজয় দিবস ২০ জুন।

একটি রথযাত্রার দিন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেই রথের সারথী। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রথ ছুটিয়ে নিয়ে দিল্লিতে চলেছেন। বঙ্গমাতা ভারতমাতায় একাকার হবেন।

পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশের নাম নয়, কেবল পূর্বতন বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিমাংশ নয়। পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাবনার নাম, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির অস্তিত্বের নাম, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির অস্মিতার নাম, পশ্চিমবঙ্গ এক অবর্ণনীয় ইতিহাসের নাম। মানুষ যখন প্রশ্ন করবে, 'পশ্চিমবঙ্গ' যখন আছে, পূর্ব নিশ্চয়ই ছিল, তা কোথায় গেল? যে বাঙ্গালি স্বাধীনতা আন্দোলনে এত বলিদান দিয়েছে, যে বাঙ্গালি এত ত্যাগ স্বীকার করেছে, নবজাগরণে পথ দেখিয়েছে, তারই উত্তরাধিকারের নাম পশ্চিমবঙ্গ।

প্রশ্ন আসবে, বাঙ্গালি কারা? বাংলা ভাষায় কথা বললেই কেউ বাঙ্গালি হয়ে যান না। ইংরেজি ভাষায় কথা বললেই কেউ ইংরেজ হয়ে যান? জার্মান ভাষায় কথা বললেই জার্মান হয়ে ওঠেন? বাংলা ভাষায় কথা বললেও তিনি বাঙ্গালি হবেন না। বাঙ্গালি হতে হলে বঙ্গ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে চলতে হয়। এই উত্তরাধিকার কয়েক হাজার বছরের পারম্পর্য। এই ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব আছেন; চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন; আছেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের মতো মনীষীরা। এই উত্তরাধিকারে দুর্গাপূজা আছে; দোল, জন্মাষ্টমী, গাজন, মনসাপূজা, রামনবমী আছে। এই সামগ্রিকতা যারা ভুলিয়ে দিতে চান, তারা বাংলা ভাষায় কথা বললেও বাঙ্গালি পদবাচ্য নন। যারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অহরহ বিদেশি শব্দভাণ্ডার সঙ্গী করে কথা বলেন, তাদের ভাষা কি বাংলা?

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে যে বাঙ্গালি দেশের পথ দেখিয়েছে তার বাসভূমিকে নিমেষে ইসলামি দেশ করে ফেলার চক্রান্ত হলো। এর বিরোধিতা করার ইতিহাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হলো। আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন হিন্দু-অস্মিতার নয়নের মণি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সুপুত্র; একাধারে শিক্ষাবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, আদ্যন্ত সেবাব্রতী, নিঃস্বার্থ এক মানুষ। রাজনীতির বাইরেও তাঁর অনবদ্য ভূমিকা। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জন্মদিনে একটি মালাও জোটে না! আজ এই বিশেষ দিনে আলোচনা করছি পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার কথা, তাৎপর্যের কথা। আলোচনার পরতে পরতে শ্যামাপ্রসাদের নাম আসবে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হলো নির্যাতিত বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য একটি হোমল্যান্ড আদায় করার রোমহর্ষক কাহিনি। কে তার কারিগর? ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। কেন বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করতে হলো? উত্তর পাবো ভাগ করার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে। আর তখনই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাবো।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই পর্বে সার্বিক নেতৃত্ব দিলেন। তখন বঙ্গপ্রদেশে তেমন বড়ো মাপের নেতা নেই। দেশ ত্যাগ করে নেতাজী বাইরে গিয়ে লড়াই করার মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আমরা জানি না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগমন করেছেন আগেই। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে সাধন মার্গে বিরাজ করছেন। ১৯৪৭ সালে এই দিনে হিন্দু বিধায়কেরা বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের জন্য ইতিহাস গড়লেন। বিভক্ত ভারতের মধ্যে থেকেই হিন্দু বাঙ্গালির আলাদা বাসভূমি রচনার জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়া। যারা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভোট দিলেন, হিংস্র মানুষের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও অনড় থাকলেন তাঁরা বীর-সাধক। যারা তৈরি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দখলদারি বজায় রাখতে নানান কৌশল অবলম্বন করলেন তারা ক্ষীর-খাদক। ক্ষীর-খাদকের সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার দিন হলো ২০ জুন পশ্চিবঙ্গ দিবস।

এই পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি না হলে কী হতো? এই ভূখণ্ড পাকিস্তানে যুক্ত হতো অথবা যুক্তবঙ্গে যেত। অতি অবশ্যই পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে চলে যেত, নতুবা আলাদা একটি ইসলামিক দেশ হতো। আপনারা জানেন স্বাধীন বাংলাদেশের কী পরিণতি হয়েছে। স্বাধীনতা পাবার কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামি দেশ হয়ে গেছে। বঙ্গপ্রদেশ মুসলমান সংখ্যাধিক্যে স্বাধীন দেশ হলে জিন্না-সুরাবর্দিদের ইচ্ছেয় 'সাবসিডিয়ারি পাকিস্তান' হতো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একেই বলেছিলেন 'ভার্চুয়াল পাকিস্তান'। তিনি এই ভূখণ্ডটিকে কোনোমতেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে দেননি।

স্বাধীন বঙ্গের নামে 'বোরখাবৃত পাকিস্তান' হবার পথেও বাধা দিয়েছিলেন তিনি। জিন্না যখন বুঝলেন কলকাতা সমেত কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, তখন মুসলমান নেতাদের দিয়ে ইংরেজ গভর্নরের পরামর্শে যুক্ত ও স্বাধীন বঙ্গের নামে ভারত থেকে কেটে দিতে চাইলেন। অনেক চেষ্টা হলো, সে এক দীর্ঘ টানাপোড়েনের ইতিহাস। কুচক্রীদের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের মোলাকাতও হয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারীদেরও আমরা চিনি। কিছু সুযোগসন্ধানী হিন্দু নেতাও ছিলেন। ভালোভাবে এদের চিনে নেবার দিনটি হলো ২০ জুন পালনের তাৎপর্য।

পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানে গেলে বা স্বাধীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলে অত্যাচারিত বাঙ্গালি হিন্দুর কোথাও স্থান হতো না, হয়তো প্রত্ন-ইতিহাসে হিন্দু বাঙ্গালির স্থান হতো। এখনও কলকাতায় বসে, রাজ্যের সুরক্ষিত শহরে বসে যে হিন্দুবাবু-সম্প্রদায় তোষণের চাদর গায়ে দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের অহরহ মুণ্ডপাত করেন, তা তাঁরই করে দেওয়া ভূমির উপর। এদের সামনে সত্যের সত্তা লজ্জিত হয়। এদের মনগড়া ইতিহাস পড়তে হয়। এই ইতিহাস এতদিন বাঙ্গালি মানতে বাধ্য হয়েছে, মনে হচ্ছে আগামীদিনে আর মানবে না। বাংলায় প্রবাদ আছে, 'যে পাতে খায়, সে পাতেই থুতকায়'। ভাবুন, কতখানি অকৃতজ্ঞ হলে মানুষ এটা করতে পারে! বাঙ্গালি হিন্দুর নির্যাতনের ধারাবাহিক ইতিহাস যারা ভুলিয়ে দিয়েছে তারা কী ধাতুতে গড়া! এককথায় বলা যায়— 'খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি।'

এদের সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ নিজেই মন্তব্য করেছিলেন— 'নিজেদের একটু ভারতীয় বলে ভাবুন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

এ রাজ্যের কয়েকটি রাজনৈতিক দল স্লোগান দেয়, 'বঙ্গ ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' কিন্তু ওদের দ্বারাই তো 'নেপোয় মারে দই' হয়েছে! ওদের বড়োবড়ো নেতাই তো পূর্ব পাকিস্তানে থাকা নিরাপদ মনে করেননি। কোটি কোটি অসহায় হিন্দুকে ওদেশে ফেলে চলে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে, বর্তমান ভূখণ্ডে। সেই বাঙ্গালি হিন্দু সামনা করলো লোলুপ নেকড়েদের। অত্যাচারে, অগ্নি সংযোগে, ধর্ষণে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে দলে দলে হিন্দু পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো রশ্চিমবঙ্গে। ২২ শতাংশ থেকে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে দাঁড়ালো ৮.৫ শতাংশ। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের ওই নেতারা ওত পেতে বসে রইলেন, সীমান্ত ডিঙোনো ভিটেমাটি হারানো উদ্বাস্তুদের একে একে ধরার জন্য। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং দখল হলো। কয়েক দশক ধরে বঙ্গপ্রদেশের সংস্কৃতিকে একেবারে পালটে দিল তাদের কনসার্ট। শ্যামাপ্রসাদকে ভুলিয়ে দিলেন; তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিলেন। ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কবি নজরুল ইসলামকে চিকিৎসার যাবতীয় সহায়তা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নজরুল কিন্তু তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেননি, তাই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নিজের প্রবাস গৃহে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। বাঙ্গলায় যে সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, সেই ফজলুল হকও তাঁকে সাম্প্রদায়িক মনে করতেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন তিনি ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির উচ্চতর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের নানাভাবে সহায়তা করতেন যিনি, তাঁকেই ওরা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'পাপ করেছো রাশিরাশি। ভুগবে কী তোমার মাসি-পিসি?' মানুষ যত সত্য ইতিহাস জানছে, মানুষের থেকে ওরা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এখন আন্দোলনকে অশুভ পথে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশ ভাগ হলো। দেশ ভাগের সমর্থক ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। "Jinnah got Pakistan, but it was one he called 'moth-eaten' because he lost East Punjab and West Bengal." পোকাকাটা পাকিস্তান জিন্নাকে উপহার দেবার কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদের। বলা হয়, 'He was successful in mobilizing the Hindu community for division; Sarat Bose and his allies could not resist.' নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র বসু, কংগ্রেসের কিরণ শঙ্কর রায়, মুসলিম লিগের সুরাবর্দি প্রমুখের সঙ্গে বাঙ্গলার গর্ভনর বারোজের ইচ্ছাও জলে গেল। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছেকেও সুকৌশলে পিছনে ফেলে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খণ্ডটিকে ভারতে ধরে রাখার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও জনসমক্ষের আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ জিতলেন। তাই সংসদে তিনি নেহরুর মুখের উপর শুনিয়ে দিতে পেরেছিলেন 'You divided India, I divided Pakistan.'

'শ্যামাজননীর মহাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ'। কবিশেখর কালিদাস রায় কবিতাতে এই মন্তব্য করেছিলেন। বঙ্গভূমিতে শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব মহাকালীর প্রলয় নৃত্যের মতো। হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচানোর জন্য; সারা দেশে 'এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান' করবার নেতৃত্ব দিয়ে খেসারত দিলেন তিনি। জীবন বলিদান দিলেন। মনে পড়বে স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা 'Kali the Mother' কবিতাটি :

'যে দেয় দুঃখে প্রেম
মৃত্যুকে ধরে বক্ষে
প্রলয় নৃত্যে মত্ত
মা-যে আসে তারই চিত্তে।'

২০ জুন বঙ্গবাসীকে এ কথা বারবার মনে করানোর জন্য আসে।
শরৎ-কিরণ-সুরাবর্দির 'ভার্চুয়াল পাকিস্তান'
ভোকাট্টা করে আনলো ছিনে মুখার্জীর ওই গান।
যুক্ত-স্বাধীন বাঙ্গলার নামে যাবতীয় শয়তানি
বিশে জুন তার সামূহিক বিষ ভাঙিয়া দিল আনি।

পশ্চিমবঙ্গ একটি আশার নাম, পশ্চিমবঙ্গ একটি আশ্রয়ের নাম। এই বঙ্গের রূপেই আছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এটাই বিশুদ্ধ বঙ্গ।

আসুন, এক ঝলকে দেখে নিই সে সময় বঙ্গপ্রদেশের পরিস্থিতি কেমন ছিল? কেন ভাগ করতেই হলো? ৬০০ বছরের বঙ্গে ইসলামি শাসনের ইতিহাস বাঙ্গালি ভোলেনি। সেই ছ'শো বছরে ধ্বংস হয়েছে এখানকার হিন্দু বৌদ্ধ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির ও প্রতিষ্ঠান। মাঝে ইংরেজ রাজত্বের ২০০ বছরে অনেকটা শান্তির পর ১৯৩৭ সাল থেকে মুসলিম লিগের শাসন, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া কলকাতার বীভৎস দাঙ্গা, তারপর নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যার পর অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা শ্যামাপ্রসাদ বলতে বাধ্য হলেন, ভারত ভাগ হোক বা না হোক, বঙ্গপ্রদেশকে খণ্ডিত করতেই হবে, তা না হলে বাঙ্গালি-হিন্দুসমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা গ্যালপ পোলের রেজাল্ট প্রকাশ করেছিল, সেখানে দেখা গেল ৯৮.৩ শতাংশ বাঙ্গালি হিন্দু সেই সময় বঙ্গবিভাগ সমর্থন করছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে জানানো হয়, প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ১০৬টি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তার মাত্র ৬টি-তে বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করা হয়েছে। এই ভাবনায় সঙ্গী হয়েছিলেন বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্যামাপ্রসাদকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখলেন ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন। সেই বছর ৭ মে একটি তারবার্তা সরকারের কাছে পাঠালেন শিক্ষাবিদদের একটি দল, তাতে শামিল হলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ড. শিশির মিত্র, ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তারা লিখলেন, বাংলাদেশে একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এবং শিক্ষা,

ব্যবসা ও শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। নানান সভায় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাজনৈতিক নেতা বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বঙ্গবিভাগের সমর্থনে কথা বললেন।

শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি ছিল মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি যদি হিন্দুপ্রধান ভারতে না থাকতে পারে তবে হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিই-বা ইসলামি পাকিস্তানে যাবে কেন? যে নীতিতে ভারত ভাগ হচ্ছে সেই একই নীতি মেনে পাকিস্তানকেও ভাগ করতে হবে। ভারতের সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

হালে পানি না পেয়ে অখণ্ড বঙ্গের সমর্থকরা স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ গঠনের ডাক দিলেন। যৌথডাক এলো মুসলিম লিগ নেতা সুরাবর্দি এবং নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর পক্ষে। কিন্তু এই ফাঁদে বাঙ্গালি হিন্দু পা দেয়নি। কারণ সুরাবর্দির জিঘাংসক ব্যক্তিত্ব তখনও হিন্দুদের কাছে তরতাজা, অমলিন। শরৎ বসু একলা ডাক দিলে কী হতো, বলা যায় না, বাঙ্গালি হিন্দু ভুল করলেও করতে পারতো।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত ইদানীংকালেও চলেছে। ২০১৬ সালের ২৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের নতুন নাম হবে 'বাংলা', হিন্দিতে 'বঙ্গাল' বা ইংরেজিতে 'বেঙ্গল'। সিপিএমের এই পরিবর্তনে আপত্তি ছিল না, কারণ এর আগে জ্যোতি বসুর আমলে তারাই ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার এই প্রস্তাব এনেছিল। ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই সব ভাষাতেই 'বাংলা' নাম হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়। যুক্তি ছিল West Bengal নাম থাকলে কেন্দ্রীয় আলোচনায় ইংরেজি বর্ণানুক্রমিকের শেষে সুযোগ পায় পশ্চিমবঙ্গ। অসুবিধা কাটাতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামটি বাদ যাক, 'বাংলা' করা হলে 'B'-এর কারণে দৌড়ে এগিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ আবেদন করতেই পারতো, কেন্দ্রীয় আলোচনায় একবার শুরু হবে 'A' থেকে, পরের বার 'Z' থেকে। তাহলে তো ইংরেজি বর্ণানুক্রমে কোণে বৈষম্য থাকে না! আসলে তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না, ইতিহাস ভোলানোই ছিল কাজ। আলোচনা তো এমন ভাবেও হতে পারতো, রাজ্যের নামগুলি কম্পিউটারে Random পদ্ধতিতে ঠিক হবে। নাম পালটিয়ে 'Paschimbanga' করা যেতে পারতো, তা কিন্তু হলো না, অন্য মোটিভ কাজ করছিল। লাখো মানুষের আপত্তিতে এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এটার মধ্যে সততা ছিল না, মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করবো। ২০০০ সালের জুলাই মাসে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙ্গালি অধ্যাপক, যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সাংসদ হয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন, বললেন, 'বঙ্গবিভাগের প্রবক্তাকে যদি আমরা বাঙ্গালির নায়ক বা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হিসেবে মানতে চাই, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নয়, লাটসাহেব কার্জনকেই আমাদের পুজোর বেদিতে বসিয়ে আরাধনা করা উচিত।' শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে একজন ইতিহাসের অধ্যাপকের এহেন মন্তব্য খুবই কুরুচিপূর্ণ। স্বদেশী জাগরণ তথা স্বাবলম্বী ভারত গঠনের বর্তমান কালপর্বে দাঁড়িয়ে আপনাদের নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না, ১৯০৫ এবং ১৯৪৭ সালের প্রেক্ষাপট কী ছিল! বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ব্রিটিশদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির জন্য। আর স্বাধীনতার বছরে বঙ্গবিভাগ হয়েছিল মুসলমান আগ্রাসকদের দ্বারা হিন্দুর মান-ইজ্জত ও সম্পত্তি রক্ষার গুরুতর অভিযোগের চিরস্থায়ী সুরাহা করতে। যে ব্যক্তি বাঁদর আর শিবের প্রভেদ বোঝেন না, তাকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই মানায় না; অথচ বিনা প্রশ্নে তিনি সংসদে চলে গেলেন। তাঁরই পূর্বজ শরৎচন্দ্র বসুর অপ্রাপ্তি কী তাকে এই মন্তব্য করতে প্ররোচিত করেছে! না কি আরও গভীরতম অস্পষ্টতা আছে?

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অখণ্ড ভারতের সাধক, তাই অখণ্ড বঙ্গেরও বীজমন্ত্র তিনি জপ করতেন। বঙ্গবিভাগ নিয়ে তখন আলোচনা, আন্দোলন চলছে। হিন্দু মহাসভার কয়েকজন যুবকর্মী শ্যামাপ্রসাদের কাছে এলেন। বললেন, দেশ তো বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আন্দোলনে মাধ্যমে উদ্দীপিত হয়েছে। আজ বঙ্গবিভাগের পক্ষে তথা বললে সেটা কী স্ববিরোধী হবে না? শ্যামাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, 'এই সেন্টিমেন্ট আমারও ছিল। কিন্তু সেন্টিমেন্ট যেন বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন না করে। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে হিন্দু ভোটদাতারা আমাদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। দেশবিভাগে বাধা দেওয়ার শক্তি আমদের নেই। লক্ষ লক্ষ বিহারি ওড়িশি বঙ্গপ্রদেশে করে খাচ্ছে। তাই সেখানে বাঙ্গালিরা আছে। গোটা বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানে পড়লে তাদের ফিরে যেতে হবে। সেখানে তখন বাঙ্গালিরা থাকতে পারবে? কোটি কোটি বাঙ্গালি কোথায় যাবে? কে ঠাঁই দেবে? তাদের সবাইকে ধর্মত্যাগ করতে হবে নিজেদের বাঁচাতে। তাই বঙ্গের যতখানি সম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করছি।' তিনি একটি সভায় দাবি করেছিলেন, 'If this succeeds, the East Pakistan will virtually perish.' পরবর্তীকালে তাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা দেশে ভেঙে গেল। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন। নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বারুদের গন্ধে ভরে উঠেছে এ রাজ্যের বাতাস

সঞ্জীব দে

গত ২৭ আগস্ট দত্তপুকুর থানার নীলগঞ্জের মোচপোলে অবৈধ বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা আজ সর্বজনবিদিত। দত্তপুকুর ফাঁড়ি থেকে মাত্র দু-কিলোমিটার দূরের ঘটনা। বলতে গেলে প্রশাসনের নাকের ডগায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই সাঙ্ঘাতিক ছিল যে বিস্ফোরণের শব্দ ছয় কিলোমিটার দূরে বারাসাত থেকে শোনা গিয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে গোটা এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কারখানা-সহ দোতালা বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশেপাশের বাড়িগুলো। পাকা বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে, বিস্ফোরণের পর ওই এলাকাকে যেন ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। বাজি কারখানার শ্রমিকদের ঝলসানো দেহ ছিটকে গিয়ে পড়ছে কয়েকশো মিটার দূরে। ঘটনাস্থলের পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার হয় এক বাজি শ্রমিকের মুণ্ডুহীন দেহ। আর এক পাশের কলা বাগান থেকে উদ্ধার হয় সেই খণ্ডিত দেহর মুণ্ডু। বাজি কারখানার মালিক কেরামত আলি ও তার ছেলে রবিউল আলির মৃত্যু হয়েছে।

মাত্র কয়েক মাসের আগেই এগরার খাদিকুল বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। বজবজের চিংড়িপোতায় মৃত্যু হয়েছিল তিনজনের। দত্তপুকুরে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আতসবাজি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাবলা রায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, 'দত্তপুকুরে আতসবাজি তৈরির মশলা ছিল না। এখানে বোমা তৈরি হতো। এখানে পটাশিয়াম ক্লোরেট, বেরিয়াম নাইট্রেট এবং অ্যালুমিনিয়াম গুড়োর মতো রাসায়নিক পাওয়া যায়। এই ধরনের কেমিক্যালের সঙ্গে আতসবাজি বানানোর কোনও সম্পর্ক নেই। এই ধরনের সামগ্রী শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরণে যে ৯ জনের শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে রনি শেখ, মাসুম শেখ, কলেজ শেখ, জিরাথ শেখ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। ২০২০ সালে আল-কায়দা মডিউলের হদিশ মেলে মুর্শিদাবাদে। দত্তপুকুর কাণ্ড ইঙ্গিত করছে জঙ্গি যোগের দিকে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এনআইএ তদন্তের দাবি করেছেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বিস্ফোরণের সঠিক তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছেন। এনআইএ তদন্তের দাবি পৌঁছেছে আদালত পর্যন্ত। বর্ধমানে খাগড়াগড়ের সেই ভয়ানক বিস্ফোরণ কাণ্ড আজও আমাদের স্মৃতিতে তাজা। তবুও একবিন্দুও বদলায়নি রাজ্যের চিত্র। রাজ্যে বোমা, বন্দুকের অবৈধ কারবারের সঙ্গে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গি জাল। জঙ্গিদের সেফ প্যাসেজ এখন পশ্চিমবঙ্গ। গত বছর নবান্নের নাকের ডগায় ডোমজুড়ের বাঁকড়া থেকে গ্রেপ্তার হয় জঙ্গি আমিরুদ্দিন আনসারী। স্থানীয় এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা জঙ্গিদের নথিপত্র তৈরি করে দিত আমিরুদ্দিন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'ইসলামিক জেহাদির হট বেড়ে পরিণত হয়েছে অসম। অপ্রিয় হলেও সত্য যে অসমে যত জেহাদি মডিউল উৎখাত হয়েছে তা সবই গড়ে উঠেছে মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে। পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিযোগ নিয়ে কথা উঠলে প্রথমেই মনে আসে খাগড়াগড় কাণ্ড।' '২০১৮ সালে গান্ধী জয়ন্তীর দিন জেহাদের হুংকারে কেঁপে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গ! খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে জঙ্গি নেটওয়ার্ক ও মাদ্রাসা যোগের মতো খবর আলোড়ন ফেলেছিল আন্তর্জাতিক স্তরে। গ্রেপ্তার হওয়া বীরভূমের ডালিম শেখ, নদিয়ার মতিউর রহমান, মুর্শিদাবাদের হাবিউর রহমান এরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হয়েও বাংলাদেশের জেএমবির সক্রিয় সদস্য ছিল। এর মধ্যে আবার বীরভূমের ডালিম শেখের উপর দায়িত্ব ছিল গোপনে ডেরা গড়ে তরুণ-তরুণীদের মগজ ধোলাই করে জেহাদি হতে উদ্বুদ্ধ করা। আবার খাগড়াগড় কাণ্ডের মূলচক্রী আজাহার আলিকে গ্রেপ্তার করা হয় অসমের বরপেটা থেকে। অসম যদি জেহাদিদের হট বেড হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গ আজ বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে। দত্তপুকুর কাণ্ডে জঙ্গিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দত্তপুকুর কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের দাবি যথাযথ। এই মারণাস্ত্র যে ঘুরপথে বাংলাদেশের জঙ্গিদের হাতে গিয়ে পৌঁছোত না তা কে বলতে পারে। বাজির নামে মারণাস্ত্র তৈরির এই অবৈধ কারখানা বন্ধ করার সদিচ্ছা রাজ্য সরকার বা রাজ্য পুলিশের নেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলেন, তা আই ওয়াশ বা ব্রেন ওয়াশ ছাড়া কিছুই নয়।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার ২০২৪-এর প্রথম দিকে বাংলাদেশ দ্বাদশ নির্বাচনের ইঙ্গিত দিয়েছে। যে দেশে গত সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্বাচন চলাকালীন জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করেছিল বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগ।

পশ্চিমবঙ্গে এই অবৈধ বোমা, বন্দুক যে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে সে দেশের জঙ্গিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যবহার হতো না, তা কে বলতে পারে। সে সত্য উদঘাটন সম্ভব একমাত্র এনআইএ তদন্ত দ্বারা। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের একটি দল শিয়ালদহ থেকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গি শাহদাত হোসেন ওরফে বাবুকে। তার কাজ ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা জঙ্গিদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে রাখা এবং কাজ শেষে সময়, সুযোগ দেখে ফেরত পাঠানো। নিমতার শক্তিশালী বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয় বাংলাদেশের নাগরিক শেখ নাসিম। পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিদের অবাধ বিচরণ দেশের পক্ষে অশনি সংকেত। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা দূর করে সজাগ হোক প্রশাসন। নচেৎ এমন নারকীয় ঘটনায় বারবার রক্তাক্ত হবে পশ্চিমবঙ্গের মাটি। আর কলঙ্কিত হবে এ রাজ্যের নাম। □

তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী ঐতিহাসিক দিনটিকে অস্বীকার করছেন

ইন্দ্র মোহন রাভা

এই রাজ্যের বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি, বিগত কয়েক বছর ধরে ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। এবারে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস রাজভবনে এই দিনটি পালন করেছেন এবং যথারীতি মুখ্যমন্ত্রীর বিরাগভাজন হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে এভাবে বিজেপির ঠিক করা একটি নির্দিষ্ট দিনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে রাজ্যপাল মহোদয় অসাংবিধানিক কাজ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা, পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিনটিতেই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম দিবস বা প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করা হোক। যেমন, তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে থাকে। এখন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত বাঙ্গালিরাই বলতে পারবেন, এভাবে নিজের পছন্দমতো কোনোদিনে কারো জন্ম দিবস বা প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে নথিভুক্ত করা যায় কি না। অবশ্য সুনির্দিষ্ট জন্ম তারিখের হদিশ পাওয়া না গেলে, আগেকার দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজের বিচার বিবেচনা মতো ছাত্রদের জন্মতারিখ লিখে নিতেন। যাইহোক, এখন দেখা যাক— 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটির এরকম কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠা দিবস আছে কি না। ইতিহাস কী বলছে?

ইতিহাস থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে, ব্রিটিশ সরকার যখন জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্ব অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের দাবিকে স্বীকার করে নিয়ে, ভারত বিভাজন করে মুসলমান জনবহুল প্রদেশগুলি (যথা পশ্চিম ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব প্রদেশ এবং পূর্ব ভারতের অখণ্ড বঙ্গ প্রদেশ) নিয়ে 'পাকিস্তান' নামক একটি ইসলামিক দেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল— (যার পেছনে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) প্রত্যক্ষ মদত এবং সমর্থন ছিল আর জাতীয় কংগ্রেসেরও সম্মতি ছিল), তখন হিন্দু মহাসভা নেতা, বাঙ্গালি হিন্দু জাতির পরিত্রাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অসাধারণ দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, প্রখর যুক্তিবোধ এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন পশ্চিম অংশকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যতম অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

অর্থাৎ মুসলিম লিগের দাবি মতো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে যাওয়া অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গেই যুক্ত রাখার জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যুক্তি ও পরিসংখ্যান নির্ভর দাবিকে মেনে নিয়ে মাউন্টব্যাটের ভারত বিভাজনের যে ফর্মূলা বা প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ করানোর জন্য প্রেরণ করেছিলেন (Mountbatten Plan), সেটি ৩ জুন ১৯৪৭' তারিখে পাশ হয় এবং পরবর্তীতে Indian Independence Act 1947-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৮ জুলাই ১৯৪৭ তারিখে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

এই মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান বা ডিক্লারেশন অব ৩ জুন ১৯৪৭-এর মধ্যে যে ধারা বা Principle, Provision, features গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যেই ধারা 3, Title : Territories, অনুচ্ছেদ (৩) "Bengal and Assam অংশে উল্লেখিত রয়েছে :

(1) The Province of Bengal as constituted under the Government of India Act 1935 ceased to exist.

(2) In lieu thereof two new provinces were to be constituted to be known respectively as East Bengal and West Bengal. একই রকম ভাবে SI 4. Title : Punjab, অনুচ্ছেদ 1) The province of Punjab as constituted under the Government of India Act 1935 ceased to exist.

(3) — Two new provinces were to be constituted to be known as West Punjab and East Punjab.

এখানেই প্রদেশগুলির/Provincial Legislative assembly-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, ভোটাভুটির মাধ্যমে ভারত কিংবা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি ঠিক করতে।

ফলস্বরূপ, ২০ জুন ১৯৪৭ তারিখে Bengle Legislative Assembly-তে ভোটাভুটির মাধ্যমে বঙ্গের পশ্চিমাংশ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা ৫৮-২১ সংখ্যাধিক্যে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই ঐতিহাসিক ২০ জুন-কেই সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস গবেষক এবং ঐতিহাসিকদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী এই দিকটিকে অস্বীকার করছেন। এখন দেখার, তিনি এবং তার পারিষদবর্গ কোন দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস মান্যতা দেন এবং পালন করেন।

এটা পরিষ্কার যে, Declaration of 3rd June 1947 অনুযায়ী ২০ জুন ১৯৪৭-এর আগে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ নামে কোনও প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল না। যা ছিল, তা হলো— Bengal Province বা বঙ্গপ্রদেশ, তার আগে সুবে বাংলা, আরও আগে, গৌড়বঙ্গ, সমতট, রাঢ় বঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ▯

ফঃ ৩

নারী শক্তিশালী হলে দেশ সমৃদ্ধ হবে

নিবেদিতা কর

ভারতীয় নারীর উন্নতি প্রসঙ্গে কী কী দিক উঠে আসতে পারে? তাহলে বলতে হয় যে একজন নারীকে তখনই সবলা বলা যেতে পারে যদি সে হয় অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন। এছাড়াও নারীকে হতে হবে শিক্ষিত, সুস্থ এবং দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল। নারীকে অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে শারীরিক ও মানসিকভাবে। কারণ নারী-ই পরিবারের ভিত্তি। মা যদি সুস্থ না থাকেন তবে পরিবার চলবে কীভাবে? ইউনিসেফ ইন্ডিয়া'র রেকর্ড অনুযায়ী, ভারতের এক-চতুর্থাংশ মহিলা, যারা মা হতে চলেছেন তারা অপুষ্টির শিকার। নারীকে শক্তিশালী হতে হলে অবশ্যই সুষম খাদ্য কী তা জানতে হবে এবং নিজের খেয়াল রাখতেই হবে। এরই সঙ্গে নারীকে শুরু করতে হবে প্রতিদিন শরীরচর্চা। শরীরচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি যোগাসন ও প্রাণায়াম উপহার দিয়েছে বহু যুগ আগে। সনাতন ধর্মের এই আশীর্বাদ আমরা এখনো নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারিনি, এটা আমাদের ব্যর্থতা।

নারীকে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে অবশ্যই সুষম খাদ্যের ওপর মনোনিবেশ করতে হবে। সুষম খাদ্য বলতে নারী যেন প্রতিদিন তার খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ প্রোটিন ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, যেমন: ডাল, সয়াবিন, ছোলা, মটর, রাজমা, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি রাখে। এছাড়াও ফাইবারযুক্ত খাদ্য, যেমন: সবুজ শাকসবজি যেন অবশ্যই থাকে। কোনো একটি বীজ খাদ্য তালিকায় থাকলে অনেক লাভ পাওয়া যায়। যেমন-,চীনাবাদাম বা কাঠবাদাম বা কুমড়োর বীজ। খাদ্য তালিকায় স্নেহ পদার্থ, যেমন: ঘি, মাখন প্রভৃতি রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে। সকলের পক্ষে দামি ফলমূল খাদ্য তালিকায় রাখা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে কম দামে একটি সস্তার ফল হলো কলা। এর অনেক গুণ আছে আর অল্প দামে বাজারে পাওয়াও যায়। দুধ ও দুগ্ধজাত যে কোনো খাদ্যই সুষম খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ নারীর ৩০ বছর বয়সের পর বোন ডেন্সিটি কমে যায়। ফলে তারা অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার রোগে আক্রান্ত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতিদিন যদি ভারতীয় মহিলারা সূর্য নমস্কার আরম্ভ করেন তবে শরীরে ভিটামিন-ডি এর ঘাটতি হওয়ার কথা নয়। কারণ আমাদের শরীরে হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সূর্যালোকের জুড়ি মেলা ভার। সেই সঙ্গে খাদ্য তালিকায় থাকা দরকার ক্যালসিয়াম যুক্ত খাদ্য, যেমন দুধ, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

ভারতীয় মহিলাদের আরেকটি অন্ধকার দিক হলো ভারতীয় মহিলাদের মাত্র ২০ শতাংশ স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করেন। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগে মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে উৎসাহ জোগানো হলেও মাসিক চলাকালীন কী কী স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হয়,সেই বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু নারীরা রজঃস্বলা হলে তাদের বিভিন্ন কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো। যেমন, অনেকেই রান্না ঘরে ঢুকতেন না, পুজো করতেন না, কোনো মন্দিরে যেতেন না। এর কোনোটাই কুপ্রথা নয় বরং এটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত বিষয় ছিল। মাসিক ঋতু চলাকালীন অনেক মহিলার তীব্র পিরিয়ড পেইন বা মাসিকের যন্ত্রণা অনুভব হয়, তাদের জন্য এই সকল কাজের অব্যাহতি অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীনকালের এইসব বিধিনিষেধ আমাদের চোখে বর্তমানে কুপ্রথা মনে হলেও আসলে এটা ছিল নারীকে কষ্টকর কাজ হতে বিরতি দেওয়ার বিভিন্ন পন্থা। ঋতু চলাকালীন অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণে এবং মুড সুইং ও পিরিয়ড পেইন বা মাসিকের যন্ত্রণা ইত্যাদির কারণে মহিলাদের ওই ক'টা দিন ভারী কাজ হতে বিরতি দেওয়া মানবিক বলে আমি মনে করি। মাসিক চলাকালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কোনোরকম সচেতনতা না থাকার কারণে অনেক ভারতীয় মহিলা সার্ভাইকাল ক্যানসারের মতো মারণ ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়। বেশিরভাগ মহিলাই জানেন না, তারা যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করছেন তা প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অবশ্যই বদলানো উচিত নতুবা তাদের জীবনে নেমে আসতে পারে বিভিন্ন রকম জটিল রোগ। এই সময়ে মহিলাদের উচিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা এবং খুব বেশি পরিশ্রম হয় এমন কাজ না করা। মহিলাদের উচিত নিজেদের পার্সোনাল হাইজিন (স্বাস্থ্যবিধি) মেইনটেইন করা, যেমন, প্রতিবার ন্যাপকিন বদলানোর পর অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।

এই সময়ে সাবান মেখে স্নান করা উচিত এবং মাসিকের শেষে মাথার চুল শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

স্বামীজী ভারতীয় নারীসমাজকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সাহসী নারী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। এরূপ নারীরাই নারীজাতির সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তিনি মনে করতেন যে নারী যত বড়ো হবেন তিনি ততই চরিত্রে ও মনে দুর্বলতা অতিক্রম করতে পারবেন। কিন্তু বাঙ্গালি নারীরা কি সবাই নিয়মিত শরীরচর্চা, গোপালন, উদ্যান সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে নিজেদের শ্রম দান করে? এর উত্তর হলো, না। বেশিরভাগই মজে আছে সফিস্টিকেটেড নারী সুলভ জীবনে। আজ নারী সমাজকে স্বামীজীর কথার অনুসরণেই বলতে হয়— নারী আর দুর্বল হয়ে থেকো না। ওঠো, নিজেকে গড়ে তোলো, নিজেকে ইস্পাতের মতো গড়ে নাও। ◻

লাল চোখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কবি নির্মলেন্দু গুণ একটি কবিতায় বলেছিলেন, '...কেউ অন্তত আমাকে/ জিজ্ঞেস করুক : 'তোমার চোখ এতো লাল কেন?' কবিতাটিতে লাইনটি অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত। কিন্তু যদি আক্ষরিক অর্থেই লাল চোখের প্রসঙ্গ ওঠে, তা হলে বিষয়টি বোধহয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত। এ বিষয়ে অবহেলা নয়, সচেতন হলেই মঙ্গল।

লাল চোখের কারণ : আমাদের শরীরে যখন কোনও রোগ বাসা বাঁধে, তখন সেটির একটি উপসর্গ হলো চোখ লাল হওয়া। শীতে অনেক সময়ে চোখ লাল হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। সর্দি, কাশি বা কোনও ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও চোখ লাল হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে চোখে অ্যান্টি অ্যালার্জি বা লুব্রিকেটিং আই ড্রপস দিলে তা চোখের লাল ভাব কমায়।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে দেখা যায়, শীতের শেষে চোখ খানিকটা লাল হয়ে থাকে। ঘন ঘন জল পড়তে থাকে। পড়তে বসলেও সমস্যা হয়। এরই সঙ্গে বারবার চোখ রগড়ানোর প্রবণতাও দেখা যায়। এই বিষয়টিকে ভারনাল কনজাংটিভাইটিস বা স্প্রিং ক্যাটারাল বলা হয়। এ ক্ষেত্রেও লুব্রিকেটিং ড্রপস দিতে থাকলে একটা সময়ের পরে উপশম মেলে। তবে পুরোপুরি তা সারতে কিছুটা সময় লাগে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্টেরয়েড ড্রপস দেওয়া যায়। অনেক সময় আবার আবহাওয়া ও পরিস্থিতির প্রভাবে বাড়তে পারে চোখের শুকনো ভাব। এসির হাওয়া, বাইরের দূষণ বা 'স্ক্রিনটাইম' বেশি হলেও বাড়তে থাকে। সঙ্গে দোসর চোখের লাল ভাব। এক্ষেত্রেও চোখের ড্রপ দিয়ে লাল ভাব কাটানো যেতে পারে।

রোগের সংকেত : ড্রপের সাহায্যে মোটামুটি চার-পাঁচ দিনের মধ্যে যদি লাল ভাব না সারে, তবে তা অন্য কোনও চোখের রোগের ইঙ্গিত হতে পারে।

● **ছানির সমস্যা :** অনেক সময়ে

চোখে ছানি হলেও তা অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয় না। এভাবে ফেলে রাখায় ছানিটি এক সময়ে ফেটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চোখে লাল ভাব দেখা দিতে পারে। সঙ্গে চোখে লাল প্রচণ্ড যন্ত্রণাও হয়। চোখের প্রেশারও বেড়ে যায় বেশ কিছুটা। এমন পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শে ছানি অস্ত্রোপচার করা উচিত।

● **সাবকনজাংটাইভাল হেমারেজ :** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঘুম ভাঙার পরে চোখ লাল হয়ে রয়েছে। আবার, যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আর ব্লাড সুগারের সমস্যা থাকে, তাঁদের চোখে রক্তক্ষরণ হতে পারে। তখনও চোখ লাল দেখায়। এই অবস্থাকে 'চোখে স্ট্রোক' হওয়া বলা হয়। ডাঃ সুমিত চৌধুরী জানালেন, এটি মূলত চোখের উপরের দিকে হওয়া এক ধরনের হেমারেজ। খুব বেশি কাশি হলে এটা হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও প্রাথমিক ভাবে ড্রপ দেওয়া যেতে পারে। যদি পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে লালচে ভাব না কমে, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। নইলে দৃষ্টিশক্তির উপরে প্রভাব পড়তে পারে।

● **চোখের বাত (আইরাইটিস) :** শরীরে বাতের উপসর্গ থাকলে অনেক সময়ে চোখের আইরিসে প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন) হয়। সেই প্রদাহ থেকেও চোখ লাল হতে পারে। এক্ষেত্রেও বেশিদিন ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসা করানো দরকার।

নজর লেন্স ও প্রসাধনে : পাশাপাশি, লেন্স বা প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারেও চোখ লাল হতে পারে। আজকাল নানা রঙের লেন্স পরেন অনেকে। চোখের মণিকে আরও উজ্জ্বল দেখাতে বা সাজ আরও আকর্ষক দেখাতে তা সাহায্য করে। কিন্তু ডাঃ চৌধুরী জানাচ্ছেন, আমাদের সচেতন ভাবে এ সব ব্যবহার করা উচিত। চিকিৎসকের কাছ থেকে নেওয়া লেন্স বেশি নিরাপদ। সেই সঙ্গে লেন্স নিয়মিত পরিষ্কারও করতে হবে। তা না হলে নানা ধরনের চোখের রোগের সূত্রপাত হতে পারে। কিন্তু অনেকেই লেন্সের যথাযথ যত্ন নেন না। তাই এসব ক্ষেত্রে 'ডিসপোজেবল লেন্স' ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। সেক্ষেত্রে এক বার ব্যবহার করেই লেন্স ফেলে দেওয়া যায়।

প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারেও নিষেধ নেই। কিন্তু ডাঃ চৌধুরীর পরামর্শ, তা ব্যবহার করলে পরে ভালো ভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সঙ্গে প্রসাধন সামগ্রীর মান যাতে ঠিক থাকে, তা দেখাটাও কর্তব্য। সেই সঙ্গে কিছু লুব্রিকেটিং ড্রপও ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে চোখে লাল ভাব হওয়ার সম্ভাবনা সে ভাবে থাকে না।

চোখের যত্ন নিন

● বারবার চোখে জল দিন। এতে চোখ পরিষ্কার থাকবে।

● চোখে হাত দেওয়ার অভ্যেসের ফলে নানা জীবাণু চোখে ঢুকতে পারে। এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে।

● বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা সেঁক ও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে গরম সেঁক কার্যকর। চোখে যখনই কোনও সমস্যা অনুভূত হবে, দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

দেশের স্বার্থে এক দেশ এক নির্বাচন প্রয়োজন

আনন্দ মোহন দাস

সাম্প্রতিককালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'এক দেশ এক নির্বাচন' নিয়ে এক পুরানো বিতর্ক নতুন করে শুরু হয়েছে। ১৯৮২ সাল থেকে এই বিষয়ে সময়ে সময়ে আলোচনা চলে এসেছে। তদানীন্তন নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টি নিয়ে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন।

কিন্তু কখনও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে মতৈক্য গড়ে ওঠেনি বা কোনো কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অগ্রসর হবার সাহস করেনি। বর্তমানে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হলো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চলতি মাসের ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পাঁচ দিনের সংসদের বিশেষ অধিবেশনের নোটিফিকেশন জারি করা এবং ওই নির্বাচনী সংস্কারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে এ বিষয়ে রিপোর্ট দেবার কথা বলেছেন। এই শুনে বিরোধী জোটের সদস্যরা গেল গেল রব তুলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। যদিও লেখা পর্যন্ত বিশেষ অধিবেশনের নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্যসূচি সামনে আসেনি। প্রকৃতপক্ষে বিরোধীদের এমন দেউলিয়া অবস্থা যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ভালো প্রস্তাব এলেও না দেখেই বিরোধিতা করা বর্তমান বিরোধীদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে পরাস্ত করতে বিরোধীদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট ইস্যু না থাকায় এরা সব কিছুই বানচাল করতে চায়। কয়েকটি দল যেমন এআইএডিএমকে, বিজেডি ও শিরোমণি আকালি দল ইতিমধ্যে বিষয়টি সমর্থন করেছে।

প্রসঙ্গত, আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর ১৯৫১-৫২ সাল থেকেই এক দেশ এক নির্বাচনের প্রথা সারা দেশে চালু ছিল এবং ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের শাসনকালে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে সম্পন্ন হতো। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি কারণে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে মেয়াদ আগে কয়েকটি বিধানসভার পতন এবং কংগ্রেস পার্টির বিভাজনের ফলে ১৯৭১ সালের লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে কেন্দ্রে কংগ্রেসি শাসনে সময়ে সময়ে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্যের বিরোধী দলের সরকারের পতন ঘটানো হয়েছে। তখন থেকেই সারা দেশে বিভিন্ন সময়ে একাধিক নির্বাচনের পরম্পরা চালু হয়ে গেছে এবং তার ফলে সারা দেশে একসঙ্গে ভোটের নিয়মের ব্যাঘাত ঘটেছে।

এ বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা এখানে আলোচনা করা দরকার। ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ীর শাসনকালে বিচারপতি বিপি জীবন রেড্ডির নেতৃত্বে আইন কমিশন সারা দেশে যুগপৎভাবে এক নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছিল। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে সমস্ত বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন একযোগে করার জন্য বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করেছিলেন। এমনকী বিজেপির ২০১৪ সালে নির্বাচনী সংকল্পপত্রের মধ্যে এটি একটি অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল। তারপর ২০১৮ সালে মোদীর শাসনকালে বিচারপতি বিএস চৌহানের নেতৃত্বে আইন কমিশন তার রিপোর্টে সারা দেশে যুগপৎভাবে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ব্যাপারে সায় দিয়েছে এবং সেজন্য সংবিধানের ৮৩, ৮৫, ১৭২, ১৭৪ ও ৩৫৬ ধারার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছে। ২০১৫ সালে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিও যুগপৎভাবে নির্বাচনের সপক্ষে দুটি পর্যায়ে ভোট করার সুপারিশ করেছে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনও তার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব ইতিমধ্যে রেখেছে। সুতরাং এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান কোবিন্দ কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে যা সংসদ অধিবেশনের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন।

আজকের আলোচনায় আমাদের দেশে 'এক দেশ এক নির্বাচনের' ফর্মূলা কতটা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত তা বিশদে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যেতে পারে। নিয়ম অনুসারে আমাদের দেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হয়ে থাকে। কিন্তু নানা কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সারা বছর কোনো না কোনো রাজ্যে নির্বাচন লেগেই থাকে। এর প্রধান কারণ হলো বিভিন্ন সময়ে বিধানসভাগুলির মেয়াদ শেষ হওয়া। তার ফলে একযোগে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের সুযোগ বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় নেই। সেজন্য সংবিধানে সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। সারা দেশে যুগপৎভাবে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নিম্নলিখিত কারণে দেশের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে।

(১) সারা বছর জুড়ে নির্বাচন সম্পন্ন হলে ভোটে বিপুল পরিমাণ আর্থিক খরচ হয়ে থাকে। সেন্ট্রাল ফর মিডিয়া স্টাডিজ-এর তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি নির্বাচনের খরচ উত্তোরোত্তর বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে ৪৮৯টি লোকসভা সদস্য নির্বাচনে খরচ হয়েছিল ১০.৪৫ কোটি টাকা। বর্তমানে লোকসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৫৪৩। পরবর্তীকালে নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে :—

বছর	খরচ (কোটি টাকায়)
২০০৪	১৪০০০
২০০৯	২০০০০
২০১৪	৩০০০০
২০১৯	৫৫০০০

এই তথ্য থেকে অনুধাবন করা যায় কী পরিমাণ নির্বাচনের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পৃথিবীর বৃহত্তম নির্বাচনী খরচ হয়েছে ভারতে।

২০১৯-এর নির্বাচনের খরচ ১৯৯৮ সালের নির্বাচনী খরচের প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং অতীতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের খরচ ৭৫০০০-৮০০০০ কোটি টাকা ছাড়ালেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সারা দেশে বিধানসভা নির্বাচনের খরচ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। বর্তমানে মোট বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৪১২৩। উদাহরণ স্বরূপ কিছু তুলনামূলক পরিসংখ্যানে নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী কয়েকটি রাজ্যের একযোগে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের খরচের পরিমাণ অনেক কম। ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের মোট খরচ হয়েছিল ৪৮৯ কোটি টাকা। আবার মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ও লোকসভার ভোট পৃথকভবে হওয়ায় নির্বাচনে খরচ হয়েছিল যথাক্রমে ৪৮৭ কোটি ও ৪৬১ কোটি টাকা।

আর একটি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশে ২০১৪ সালে একযোগে লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের মোট খরচ হয়েছিল ১৬.৮৯ কোটি টাকা। অথচ ওই বছর প্রায় একই ধরনের রাজ্য দিল্লির পৃথকভাবে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৩৪.৫ কোটি ও ৯৮.৭৬ কোটি টাকা। সুতরাং এই তথ্য থেকে সহজেই অনুমেয় যে একযোগে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হলে নির্বাচনী খরচ অনেক কম হয়। সুতরাং আলাদাভাবে ভোট হলে বিপুল পরিমাণ আর্থিক খরচ হয় যা দেশের অর্থনীতির উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে।

সারা দেশের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একযোগে সম্পন্ন হলে দেশ ও জনগণ কীভাবে উপকৃত হবে

(১) বিপুল পরিমাণ নির্বাচনী খরচ বাঁচাতে পারলে সরকার উন্নয়নমূলক কাজে আরও বেশি খরচ করতে সক্ষম হবে এবং গণতন্ত্র মজবুত হবে।

(২) নির্বাচনের কাজে যুক্ত বিপুল সংখ্যক সুরক্ষা বাহিনী, সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার, সাধারণ কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বারবার নির্বাচনের কাজে যুক্ত হলে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং জনগণের প্রয়োজনীয় সরকারি কাজও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ ভোটগ্রহণ থেকে ভোটগণনা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক কর্মচারীদের নির্বাচনী কর্মী হিসেবে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করে থাকে। সুতরাং পাঁচ বছরে একবার নির্বাচনের কাজে যুক্ত হলে অসুবিধাগুলি দূর হয়।

(৩) সারা বছর বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালু থাকলে নির্বাচনী আচরণবিধির কারণে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় যা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

(৪) স্কুল শিক্ষকরা ভোটের কাজে বারবার ব্যস্ত থাকায় ছাত্র- ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। সর্বোপরি স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নির্বাচনের কাজে ও সুরক্ষা বাহিনীর থাকার জন্য বেশ কিছু দিন ছাত্রদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে।

(৫) দেশের সুরক্ষা বাহিনীকে দেশের সুরক্ষার পরিবর্তে নির্বাচনের কাজে বেশি ব্যবহার করতে হয় যা একযোগে নির্বাচন হলে বাহিনীর যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সুবিধা হয়।

(৬) দেশের লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভাগুলির ভোট একযোগ হলে সরকারগুলি পাঁচ বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উন্নয়নমূলক কাজে মন লাগিয়ে জনগণের সেবা করতে পারবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার যথেষ্ট সময় পাবে। তার ফলে দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

(৭) বারবার নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ ব্যয়ে দৈনন্দিন বাজারে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায় এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

(৮) পাঁচ বছরে একবার নির্বাচন হলে সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বারবার রাজনৈতিক চাঁদার কবল থেকে রক্ষা পায়।

(৯) পাঁচ বছরে একবার নির্বাচন হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খুনোখুনি, রাহাজানি, হিংসা ইত্যাদির পরিবেশ হ্রাস পায় এবং জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বঙ্গপ্রদেশের নির্বাচনে হিংসার প্রেক্ষাপটে এক দেশ এক ভোট বিষয়টি বাঙ্গালির কাছে আরও বেশি প্রয়োজনীয়।

পরিশেষে বলা যায় পাঁচ বছরে একবার লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভাগুলির ভোট একযোগে চালু হলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সেবায় আরও বেশি সময় মনোনিবেশ করতে পারবে এবং উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। বারবার নির্বাচনে উদ্ভূত বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয় রোধ করে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নমুখী কাজে কেন্দ্রীয় সরকার আরও বেশি উদ্যোগ নিতে পারবে। তার ফলে দেশের জিডিপি ও বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সমস্ত বিরোধী দলগুলির রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ‘এক দেশ এক ভোট’ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়াই হবে উচিত কাজ।

এক দেশ এক নির্বাচনে একমত হলে তা একযোগে দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল

এক দেশ এক ভোট কোনো প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক বিষয় নয়, এ এক রাষ্ট্র ভাবগভীরতা এবং রাজনৈতিক চিত্ররূপময়তা।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যদি আমরা ভিন রাজ্যে ভ্রমণে যাই বা অন্য কোনো কাজে যাই, প্রথম কোন বিষয়ের দিকে নজর রাখি? আবহাওয়া। ঠিকই তো আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে আমাদের সব কাজ, সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা আকার আকৃতি পায়। কিন্তু শুধুই কি প্রাকৃতিক আবাহওয়াই আমরা দেখি? না বোধহয়। রাজনৈতিক আবহাওয়াটাও এখন সদাব্যস্ত মানুষের মাথায় রাখতেই হয়। ধরুন, একজন খুব আশা সহকারে প্রবল গ্রীষ্মে দু'দিন উত্তরবঙ্গ সফর করবেন ভাবলেন। যদি ঠিক সেই সময়েই বিধানসভা নির্বাচন চলে, নির্বাচনী সতর্কতা হেতু কোনো কোনো অঞ্চলকে নির্বাচন কমিশন অতি স্পর্শকাতর চিহ্নিত করে। তখন ব্যক্তিটি পৌঁছালেন বটে কিন্তু তার ভ্রমণ বা অন্য কাজ তো সেবারের মতো ভেস্তেই গেল। তখন প্রথম প্রতিক্রিয়াই হবে, কী

'এক দেশ এক নির্বাচনের' লক্ষ্যে রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে কমিটি

২০১৪ সালের নির্বাচনী সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, সেই লোকসভা নির্বাচনে জিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার সংসদের ভেতরে ও বাইরে 'এক দেশ এক ভোট' সংক্রান্ত বক্তব্য রেখেছেন। ২০১৮ সালে সংসদে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই বিষয়ে বলেন যে বারবার নির্বাচন দেশের মানব সম্পদের ওপর এক বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং আদর্শ আচরণবিধি জারি হওয়ার ফলে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়। ইতিমধ্যে একটি সংসদীয় কমিটি নির্বাচন কমিশন সমেত এই বিষয়ের সব অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে একত্রে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখেছে। আরও বিশ্লেষণ করে 'এক দেশ এক ভোট'কে অন্তিম রূপদানের জন্য একটি বাস্তবসম্মত রোড ম্যাপ ও ফ্রেমওয়ার্ক গঠনের বিষয়টি আইন কমিশনের পর্যালোচনাধীন। গত ১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ এক নির্বাচন' কার্যকর করার বিষয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের কমিটি গঠনের বিয়য়ে ঘোষণা করে।

করতে যে ভোটের এত হ্যাপা কে জানে বাপু! ঠিকই তো। নির্বাচন যেমন অতি প্রয়োজন তেমনই হ্যাপাও। যদি আমরা হিসেব করি তবে দেখব প্রতি বছরই কোনো না কোনো রাজ্যে বা একাধিক রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজে। চলে তুমুল রাজনৈতিক তরজা, লড়াই। শুরু হয়ে যায় নির্বাচন বিধির বাঁধন। আরও হাজারটা খুঁটিনাটি বিষয় প্রদেশ ও অঞ্চলভেদে সংযোজন হয়।

যেমন ধরুন, কোনো রাজ্যে কখনো বোর্ড পরীক্ষা। তাকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ভোট করা। কখনো কোথাও বর্ষা, কখনো প্রবল খরা। এর মধ্যে আবার বাড়তি উত্তেজনা— এতদিন হয়ে গেল নির্বাচন কেন হবে না। কেয়ার টেকার সরকার একটা লবডঙ্কা। অবিলম্বে ভোট চাই, সরকার গঠন চাই। যেই ভোটের দিনক্ষণ ভাবা হচ্ছে অমনি চলে এল কয়েকটা আঞ্চলিক নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। এবার কোনটা আগে হবে। ভারী চিন্তার বিষয়, কোনটা আগে? বিধানসভা নাকি পৌরসভা নির্বাচন। কেন, একি নতুন নাকি? আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই তো এই সংকট চলেছিল ২০২০ নাগাদ। পুরসভাগুলো তখন মেয়াদ শেষে ধুঁকছে। পরিষেবা লাটে উঠেছে। করোনা সংকট গেছে, কিন্তু পুরভোট না করানোর অজুহাত তখনও আছে। বারবার রব উঠেছিল হোক না পুরভোট। হলো কোথায়? চিৎকার করতে করতে চলে এল ২০২১ বিধানসভার নির্বাচন। তারপর তিন তিনটে বিধানসভার উপনির্বাচন। তারপর ২০২২-এ হলো পৌরসভার নির্বাচন। তারপর ২০২৩ আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং দু' একটা বিধানসভার উপনির্বাচন। বাদ পড়ে যেতেও পারে হিসেবে স্মরণে আনতে আরও কোনো নির্বাচন। এই হতে হতেই আসতে চলল ২০২৪-এর লোকসভার আয়োজন। এই চিত্র আমাদের নয়, সব রাজ্যেই কম-বেশি এক।

বলা হয়নি! সামনে বেশ কিছু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনেরও কড়া নড়ছে। মোটের ওপর কী দাঁড়াল, বছর বছর সব রাজ্যেই এক বা একাধিক নির্বাচন বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর। কিন্তু আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা যদি আবার ১৯৬৭-র সময়ের মতো হয়। অর্থাৎ সারা দেশে একটি নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময়ে একযোগে লোকসভা এবং সংশ্লিষ্ট সব রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন হয়। তবে তো সময়, ঝঞ্ঝাট, অর্থ ব্যয়, সর্বপরি নির্বাচন পরিচালনার সংকট অনেক কমে যায়। প্রস্তাব ২০১৪-র সময় থেকেই ধীর স্বরে উঠেছিল। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আজ তা সজোরে যুক্তি সহকারে আহ্বান করছে। 'এক দেশ এক ভোট' (One Nation One Election) এই মুহূর্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন দেশের স্বার্থে এবং মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে। ১৯৬৭-র লোকসভা এবং দেশজোড়া সব রাজ্যের বিধানসভা এক সঙ্গেই হয়েছিল। সেদিন নির্বাচন সম্পন্ন হতে কোনো সমস্যা ঘটেনি। সমস্যা সমস্যা করে যারা আজ ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন তাঁদের বুঝতে হবে সমস্যা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হয়নি। হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেসকে নিয়ে। দলের অভ্যন্তরেই বিশৃঙ্খলা এবং কলহে দল ভেঙেই তৈরি হচ্ছিল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। উদাহরণে বলা যেতে পারে, উত্তরপ্রদেশের চৌধরী চরণ সিংহের কথা। যিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠন করলেন সংযুক্ত বিধায়ক দল। ফলে, পাঁচ বছরের ইউনিফর্ম সিস্টেম গেল ভেঙে। ১৯৭২-এর লোকসভা এবং ইন্দিরার গরিবি হটাও স্লোগান। লাভের মধ্যে যেটা দেখল ভারতের ভোটার, একাধিক রাজ্যে ধারা ৩৫৬ জারি এবং রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়ার অপকৌশল। ফলে পুনরায় ইউনিফর্ম প্যাটার্ন ভেঙে যায়। তারপর বিভিন্ন প্রদেশেও কংগ্রেসের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাধিক আঞ্চলিক দলের জন্ম হয়। তারা কেউ-ই কংগ্রেসের কথায় লোকসভা ও বিধানসভা একযোগে করতে রাজি থাকেনি। ক্রমশ রাজনৈতিক দল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে চলল। বৃদ্ধি পেতে থাকল নির্বাচনী ঢাকের আওয়াজ। মানুষের প্রচার প্রক্রিয়াও হিড়িক দেখাতে থাকল। প্রচারে মন বেশি চলে গেল, কিন্তু অনেক সময়ই লক্ষ্য করা গেছে সরকার পরিচালনায় সেই উৎসাহ কোথায়!

Populism কী? এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে একথা শোনা যায় 'Populism is an enemy of development'--- তাই ঘন ঘন ভোট আনাগোনা মানে এক কথায় তা প্রকৃত উন্নতি ও উন্নয়নের পরিপন্থী। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি অধিবেশন বসবে ১৮-২২ সেপ্টেম্বর। বিষয় : এক দেশ এক নির্বাচন। ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। যারা প্রস্তাবনা খতিয়ে দেখবেন এবং সংবিধানের খুঁটিনাটিও পরীক্ষিত, আলোচিত হবে। এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এক দেশ এক নির্বাচনের প্রথম সুফল যে অর্থ ব্যয়ে রাশ টানা, তা বুঝতে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়। যদি ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনের দিকেই তাকাই, ব্যয় ছিল ৩,৮৭০ কোটি টাকা! তার ঠিক পরের বছরই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ব্যয় ছিল আনুমানিক ৩০০ কোটি। যদি নির্বাচন একযোগে হয় তবে প্রতি বিধানসভা

নির্বাচনের যে অতিরিক্ত ব্যয় তা সংকোচন সম্ভব। একবাক্যে তা কি উন্নয়ন নয়? একযোগে নির্বাচন সম্পন্ন হলে সময় অনেক বাঁচবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি ও কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। কারণ যত বেশিবার ভোট এসে যায়, ততবারই আদর্শ আচরণ বিধি জারি হয়। যা নতুন প্রকল্প ও সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায়। ২০১৪-র নির্বাচনী সংকল্পপত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি এক দেশ এক নির্বাচনের উল্লেখ করেছিল। এবং ২০১৫-র পর থেকে বিভিন্ন সময়ে তা খতিয়ে দেখেছে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি, আইন কমিশন এবং নীতি আয়োগ। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ইতিবাচক রিপোর্ট জমা দিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি বিএস চৌহান। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরাও এই প্রস্তাবের পক্ষে। ২০২২-এ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল চন্দ্রও জানিয়েছেন একই সময়ে সারা দেশের ভোট করার সমর্থক তাঁরা।

নিঃসন্দেহে এই কাজ কখনোই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী হবে না। বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ব্যাপী বিস্তারিত চর্চা চলছে। সবচেয়ে বড়ো কথা আইন কমিশনের দাবি, একসঙ্গে নির্বাচন সংঘটিত হলে মানুষের ভোট দানের প্রবণতা আগের চাইতে বৃদ্ধি পাবে। এইবারেই যে প্রথম প্রস্তাব তা নয়। ১৯৮৩ সালেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন সকল নির্বাচন একযোগে সম্পন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তা গ্রহণ করেনি কেন্দ্র সরকার। ১৯৯৯-এর আইন কমিশনের রিপোর্টেও কিন্তু একযোগে নির্বাচনের ওপর জোর দেওয়া হয়। তাই হঠাৎ করে মোদী সরকার এসেই এই মারপ্যাঁচ করছে এমন বলাটাও যুক্তিতে পোক্ত হবে না। মোদী সরকার এই ব্যবস্থার জন্য সদর্থক ভূমিকা খাতায়-কলমে নিচ্ছে যা আগে কেউ করেনি। এই প্রস্তাব যে সারমর্মযুক্ত এবং জনবিরোধী বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বিরোধী নয় তা নিশ্চিত। তাই এই মর্মে একাধিকবার হাওয়া উঠেছিল। এবার তাতে পাল যোগ হলো। একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকার এক দেশ এক ভোট— এই মর্মে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেও তাতে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, এসপি, ডিএমকে এবং আরও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বৈঠকে উপস্থিত থাকেনি। তাই আজ যদি তারা বিরোধিতা করে তবে তা কি সত্যিই ঠিক হবে? বৈঠকের পর বৈঠক যারা অগ্রাহ্য করে অনুপস্থিত থাকে এবং প্রস্তাবের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোনদিকে তাদের যুক্তি তাই-ই ধরা যায় না। কিন্তু বিল পাশের সময় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলে। আবিষ্কার করে, যা কিছুই সংস্কার চলছে সবটাই অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধানবিরোধী।

প্রসঙ্গত, সংবিধান তো আর বেদ নয়। এর আগেও দেশের স্বার্থে এমনকী কংগ্রেস আমলে একাধিকবার রাজনৈতিক স্বার্থে সংখ্যালঘু তোষণের স্বার্থেও পর্যন্ত সংবিধানের নানান আর্টিকেল পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, পরিবর্তিত করা হয়েছিল। তাই সংবিধানে হোঁচট খাবে এই বিল— এই ভাবনায় যেসব আঞ্চলিক দল হা-হুতাশ করছে, তারা সংবিধানের বেশ কিছু অনুচ্ছেদের পরিবর্তিত রূপ চান। সংসদে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি না করে বরং নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ এবং তার বদল সংক্রান্ত গঠনমূলক চর্চা মতামত প্রদান হোক না। ২০২২-এর ডিসেম্বরেও আইন কমিশন দেশের রাজনৈতিক দল, ভারতের নির্বাচন কমিশন, আমলা, শিক্ষাবিদ-সহ বিশেষজ্ঞমহলের মতামত চেয়েছিল। তাই শিবসেনার প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী কিংবা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গে যখন বলেন আলোচনা ছাড়াই সব বিল পাশ করার তালে থাকে বিজেপি, তা ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রসঙ্গত, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৩ যেখানে সংসদের দুই কক্ষের মেয়াদের কথা উল্লেখ রয়েছে, অনুচ্ছেদ ৮৫ যা লোকসভা ভাঙার নিয়ম নথিভুক্ত করেছে, অনুচ্ছেদ ১৭২ যা রাজ্য বিধানসভার মেয়াদের কথা বলে, অনুচ্ছেদ ১৭৪ যা বিধানসভা ভাঙার কথা বলে এবং ৩৫৭ নাম্বার ধারা (রাষ্ট্রপতি শাসন) ও ১৯৫১-র ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনেরও কিছু

ফঃ ৪

অংশ প্রয়োজন মতো সংশোধন হতে পারে। যাঁরা সংবিধানের কারবারি তাঁদের ওপর আমাদের পূর্ণ ভরসা রয়েছে এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে। আসল কথা, বিরোধীদের গাত্রদাহ অন্য কারণে। তাদের আশঙ্কা এক দেশ এক ভোট হলেই বোধহয় কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বিজেপি অধিক জন সমর্থন পাবে। কারণ কেন্দ্রমুখী টানে অধিক ভোট আকর্ষণের সম্ভাবনা থাকছেই। কেন্দ্র ও রাজ্য ভোট একযোগে হলে পাছে কেন্দ্রমুখী ফোকাস ভোটারের অধিক থাকে এবং সেই প্রভাব যদি রাজ্য বিধানসভাতেও আসে! এই স্বমস্তিষ্ক আবিষ্কৃত সংকটে ভুগছে আঞ্চলিক দলগুলি। তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তাদের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রবল মোদী হাওয়াতেও কিন্তু ওড়িশার বিজু পট্টনায়কের আঞ্চলিক দল বিজেডি জয়লাভ করেছিল।

তাই বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলের প্রতি যদি জনসমর্থন থাকে তাতে বিন্দুমাত্র ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে না এক দেশ এক ভোট প্রক্রিয়া। হ্যাঁ, একটা অসুবিধা হলেও হতে পারে; কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এখনও ঘুরপথে ভেট দেওয়া, অর্থ বিলি ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করে। এক দেশ এক ভোটে সেই বদভ্যাসে ভাটা আসবে বেশ জোরেই। বিরোধীদের একটা সমীক্ষা মাথাব্যথার কারণ হতেও পারে। ২০১৫-তে আইডিএফসি ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, একযোগে নির্বাচন করলে রাজ্যের ভোটারদের বিধানসভা ও লোকসভায় বিজয়ী দল বা জোটকে পুনর্নির্বাচিত করার সম্ভাবনা থাকে ৭৭ শতাংশ পর্যন্ত। যদিও এই সমীক্ষা কোন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে ওই প্রতিষ্ঠান করেছিল তা উল্লেখ করেনি। তাই এই বিষয়ের ওপর বিস্তারিত পর্যালোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত নয়। লোকতন্ত্র এক অদ্ভুত সংখ্যাতত্ত্বের ম্যাজিক। এখানে এমনভাবে সমীক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধোপে টেকে না। একটা অদৃশ্য কারণের জন্যও নির্বাচনের ফল প্রত্যাশার আকাশ- পাতাল ফারাক ঘটে।

তবে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার কুরেশি এক দেশ এক ভোটের পক্ষে থেকেও সেনা যোগ/প্রয়োগ সম্বন্ধে বলেছেন, 'Unless there is the deployment of an adequate number of paramilitary forces, even simultaneous elections will have to be carried out over a period of 2-3 months which will defeat the purpose. Currently, an election sees deployment of about 800 company forces. The Govermment will have to provide at least 3000-3500 companies to ensure that the election is conducted within 30 days at least.' তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেনা নিয়োগ-সহ অন্যান্য লজিসটিক্সের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যদি সবুজ সংকেত দেন তবে এক দেশ এক ভোট কেবলমাত্র রাজনৈতিক তরজা কাটিয়ে শুরু হওয়ার অপেক্ষা। আমেরিকার নির্বাচনে কথিত আছে 'Coattail effect'— যার মানে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নায়ক চরিত্র বা নিউক্লিয়াস নিজের পক্ষে ভোট আকর্ষণ করতে পারেন। পরোক্ষ ভাবে ভোটার প্রভাবিত করা বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইকনমিক্স টাইম ব্যুরো উল্লেখ করছে ভারত নির্বাচনের এই নব প্রক্রিয়া হবে 'Kurta Tail effect'— কেমন যেন বিরোধীদের মুখপত্র ধ্বনি ঠেকছে। ভারতের নির্বাচনের ইতিহাস এবং অনবদ্যতার খোঁজ করলেই বোঝা যাবে এক যোগে নির্বাচন মানেই তা কারোর পক্ষেই হাওয়া বয় না। বইলে কেন ঘটল ১৯৬৭-র ফল? তখন তো সর্বত্র কংগ্রেস আর কংগ্রেস। একযোগে দুই নির্বাচন। তাও কী ঘটল? ১৮টি রাজ্যের যখন সমান্তরাল একযোগে নির্বাচন হলো তখন কংগ্রেস তো চারটি রাজ্যে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতেই পারল না। রাজ্যসভায় ডিসেম্বর ২০১৫-তে, 'Feasibility of Holding Simultanceous Elections to the House of People (Lok Sabha) and State Legislative Assemblies' শীর্ষক রিপোর্টেও ১৯৯৯-এর আইন কমিশনের রিপোর্টের অনুসন্ধান এবং উল্লেখ করেছে। যা আগেই উল্লেখ করেছি। তারপর ফেব্রুয়ারি ২০১৮, নীতি আয়োগের এক দেশ এক নির্বাচন প্রস্তাবের স্বপক্ষে পিপি চৌধুরী উল্লেখ করেছিলেন ওই বিষয়টি পার্লামেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জ্ঞাপন করা হয়েছে। এবং তিনি বলেন একযোগে নির্বাচন দেশে দু'দফায় করার উল্লেখ সেদিন করেছিলেন। বলেন, 'The paper envisages holding simultaneous elections to the Assembles of about one half of the States along with Lok General Elections due in April-May 2019 and the rest of the States in the mid-way, i.e. October-November, 2021, entailing extension or curtailment of the duration of Assemblies wherever required.'

তাই পূর্বে উল্লিখিত প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার কুরেশি লজিসটিকসের যে চিন্তা রেখেছেন তা উপরিউক্ত এই পদ্ধতিতেও সমাধান হতে পারে। কংগ্রেসের আমলে রাজ্য দখলের প্রধান অস্ত্র ছিল যে কোনো অছিলায় ৩৫৬ প্রয়োগ এবং নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে ফেলে দেওয়া। তাই সমান্তরাল নির্বাচন বেশ কয়েকবার করলেও (প্রস্তাবনা ছাড়াই) তারাই রাষ্ট্রপতি শাসনে রাজ্য সরকার ফেলে দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাঁচ বছরের চক্রে বার বার বিঘ্ন করেছে। তাই ওইসব কংগ্রেসি বছরের উদাহরণ দিয়ে কেউ যেন না বলেন, এক যোগে নির্বাচন হয় না।

আজকে উদ্দেশ্য একটাই। ভোট ভোট করে সময়, অর্থ ও অহেতুক লোকবল ব্যয় না করে তাকে শাসন ও প্রশাসনিক কল্যাণে ব্যবহার করা। রাজনীতিও এক সৃষ্টিশীল সত্তা নিয়ে আসুক মানুষের সামনে। তাকে নিয়ে মানুষের মনে অনেক দ্বিধা ও সমালোচনা তৈরি হচ্ছে। সেই দ্বন্দ্ব মেটাতে পারে একমাত্র সুপ্রশাসন তথা রাজধর্ম। যারা এক দেশ এক নির্বাচনের বিরোধী তারা স্বার্থ চরিতার্থ রাজনীতির কারবারেই পাকা রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রণয়নের শ্রমিক হতে পারছেন না। এক দেশ এক ভোট কোনো প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক বিষয় নয়, এ এক রাষ্ট্র ভাবগভীরতা এবং রাজনৈতিক চিত্ররূপময়তা। ■

উত্তরবঙ্গ সীমান্ত চেতনা মঞ্চের প্রান্ত অধিবেশন

গত ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সীমান্ত মঞ্চের দুই দিবসীয় প্রান্ত অধিবেশন শিলিগুড়ি শহরের অগ্রসেন ভবনে অনুষ্ঠিত হলো। অধিবেশনে সাংগঠনিক ১১টি জেলা থেকে ১১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত চেতনা মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংযোজক গোপালকৃষ্ণজী, সহ সংযোজক প্রদীপনজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়।

গোপালকৃষ্ণজী বলেন, আমরা বহু বছর ধরে সীমান্ত সুরক্ষার কাজ করে চলেছি। আমাদের শক্তি কম থাকার পরেও উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান সীমান্ত সুরক্ষার জন্য সীমান্তবাসী লোকেদের মধ্যে জাগরণের কাজ করে চলেছি। জলধর মাহাত বলেন, উত্তরবঙ্গে চিকেন নেকের মতো জায়গা রয়েছে, যার একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে নেপাল সীমান্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। না হলে শিলিগুড়ি-সহ পূর্বভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফলে দেশবিরোধী গতিবিধি চলছে। সীমান্ত চেতনা মঞ্চের কার্যকর্তারাই পারেন এই সমস্যার সমাধান করতে। আমাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। তিনি কার্যকর্তাদের কী কী কাজ করতে হবে তা বলতে গিয়ে বলেন, সীমান্তে যা যা আছে তার এক ডকুমেন্টারি তৈরি করে সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রদীপনজী পুরো সময় উপস্থিত থেকে সবাইকে উৎসাহিত করেন। প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায় পাঁচ গতিবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সীমান্ত দর্পণ নামে একটি পুস্তক উন্মোচন করেন গোপালকৃষ্ণজী। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি প্রদীপ চন্দের কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

হুগলীর জাঙ্গিপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণসাজে শোভাযাত্রা

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের মথুরাবাটি গ্রামে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নিবেদিতা পাঠদান কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং মথুরাবাটি বিবেকানন্দ সেবা সমিতির সহযোগিতায় শিশুদের কৃষ্ণসাজে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শিশুমনে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রামের ৮৬ জন শিশু কৃষ্ণসাজে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ছিল। শোভাযাত্রাকে গ্রামবাসীরা শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে স্বাগত জানায়।

মালদহে বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরের মতো এবারও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর দিন মালদহের বাচামারী বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এদিন শিশুমন্দিরের অরুণ ও উদয় শ্রেণীর ১২০ জন ভাই-বোন কৃষ্ণ সেজে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যা ভারতী পূর্বক্ষেত্রের শিশুবাটিকা সংযোজক পঙ্কজ কুমার সরকার, অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্য বুদ্ধদেব দাস, শিক্ষক উত্তম ভট্টাচার্য, শিশুমন্দিরের সহ সভাপতি বিজয় ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ দিগম্বর সিংহ, পরিচালন সমিতির সদস্যা শ্রীমতী জবা দাস। অনুষ্ঠান শেষে শিশুমন্দিরের আচার্যারা স্বহস্তে তৈরি করা লুচি, ক্ষীরের পায়েস, ক্ষীরের নাড়ু ও তালের বড়া কৃষ্ণরূপী ভাই-বোনেদের ভোজন করান। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিশেষ ছয়জনকে উপহার স্বরূপ গোপাল মূর্তি এবং সকলের হাতে গীতাপ্রেসের পুস্তক গোপাল, কানাই ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী প্রদান করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। পঙ্কজ সরকার

জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। পরিশেষে দিগম্বর সিংহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে স্বাবলম্বী ভারত অভিযান কর্মসূচি

গত ২১ আগস্ট বিশ্ব উদ্যমিতা দিবস বা ওয়ার্ল্ড এন্ট্রাপ্রেনিয়র ডে উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে স্বাবলম্বী ভারত অভিযান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের অঙ্গ

হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে স্বদেশী রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে এই রথযাত্রা শুরু হয়ে হাওড়া মহানগর, কলকাতা মহানগর ও হুগলী জেলা পরিক্রমা করে। পথিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারমুলক কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়। হাওড়া জেলার বেলুড় মঠ সংলগ্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় এবং লালবাবা আশ্রম, হুগলী জেলার প্যারীমোহন মহাবিদ্যালয়, কলকাতা মহানগরে কাশীপুর উদ্যানবাটি এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন ও সংলগ্ন বিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, মহামিলন মঠ প্রভৃতি স্থানে প্রচার কার্য করে এই কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। মোট যাত্রাপথ ছিল ১০০ কিলোমিটার। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক অধ্যাপক নির্মল মাইতির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই রথযাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

অক্সফোর্ড বুক স্টোরে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২৯ জুলাই কলকাতার নিউ মার্কেটস্থিত অক্সফোর্ড বুক স্টোরে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের উৎস ও বিকাশ' শীর্ষক সান্ধ্যকালীন আলোচনা সভায় হিন্দু জাতীয়তাবোধের ওপর দুটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ দুটি হলো 'প্রাক শতবর্ষের আলোয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা' এবং 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুরুষ আশুতোষ লাহিড়ীর কয়েকটি ঐতিহাসিক ভাষণ'। অধ্যাপিকা ড.

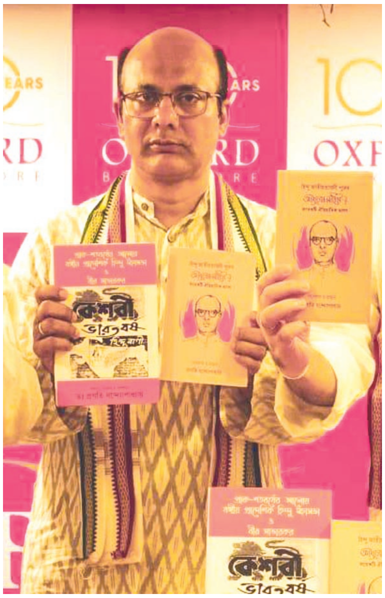

প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু বছরের নিরলস গবেষণালব্ধ গ্রন্থদুটির অধ্যয়ন তরুণ প্রজন্মের নিকট ভারতমাতার স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসের বিপরীতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়ার মাধ্যমে অজ্ঞাত এক ইতিহাসের অধ্যায়ের আবরণ উন্মোচন করবে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু, ড. অনির্বাণ গাঙ্গুলি এবং ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। অনুষ্ঠানের সফল সঞ্চালনা করেন সুমন ভৌমিক এবং ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম জিজ্ঞাসা—তেরো

আনন্দই জীবন বেদ—আনন্দই ব্রহ্মা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সব নদীই সঙ্গমমুখি। পথ বহু, লক্ষ্য এক। সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্যও এটাই। চতুরাশ্রম ভিত্তিক ভারতীয় জীবন ও সমাজ। এই সমাজ ব্যবস্থায় সমান গুরুত্ব ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের। জীবনের এই চারটি আশ্রম যাপনের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম নীতিও রয়েছে। সেই নীতিগুলিই ধরে রেখেছে সমাজকে।

সনাতন ধর্মের ভিত্তি বেদ। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বৈদিক জীবন আবর্তিত বেদকে কেন্দ্র করে। এই সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি আশ্রমের আচরণীয় ও করণীয় সম্পর্কে রয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি। তবে সব নির্দেশেরই লক্ষ্য সেই এক অনন্তে পৌঁছোবার জন্য। সে লক্ষ্য আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হওয়ার, ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ বা ব্রহ্মে লীন হওয়াই যে চরম ও পরম সত্য—শত বিপ্লবের মধ্যেই এই কথাটি হারিয়ে যায়নি বিস্মরণের অন্ধকারে। বিচ্যুতির মুহূর্তেও আত্মনিষ্ঠ ভারত এই কারণেই।

বিশেষ করে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস যে মানবজীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তা পালনের নিয়মবিধির উল্লেখ রয়েছে প্রতিটি বেদের অন্তর্গত গৃহ্য ও শুল্ব সূত্রগুলিতে। এইসব নির্দেশ সনাতনী প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার যে তাদের পৃথক অস্তিত্বের কথা মনেই আসে না। সে কারণেই অনেকের ধারণা, সনাতন ধর্ম কেবল 'দেহি-দেহি' সর্বস্ব। অন্যান্য ধর্মে জীবন যাপনের কথা প্রাধান্য পেলেও সনাতন ধর্মের শাস্ত্রকাররা ওই কথাগুলি ভুলে গেছেন বিলকুল। এ ব্যাপারে নেই কোনো শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। তাঁর এককথায় বিশেষ করে গৃহ্য সূত্রগুলির পাতায় দৃষ্টি বোলানো বুঝছেন ওই ধারণা কত ভুল। ব্যবহারিক ও ধর্মীয় জীবন যাপনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে গৃহ্য ও শুল্ব সূত্রগুলিতে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম—বিধি ব্যবস্থা। সেখানে দুই জীবনই পেয়েছে সমান গুরুত্ব।

সনাতন হিন্দুর জীবন ব্রহ্মময়। ব্রহ্মলাভের বাসনা তার অন্তরে- চেতনে-অবচেতনে, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে। সে কারণেই সতত ওঠে প্রশ্ন, কে ব্রহ্ম? কী তাঁর স্বরূপ। শুধু আজ বা কাল নয়, এ প্রশ্ন চিরকালের। সাধারণ মানুষ থেকে প্রাজ্ঞজন অথবা মুনি-ঋষিদেরও ওই একই প্রশ্ন—নানাভাবে—নানা সময়।

সেই পুরাকালের কথা। ঋষি বরুণের পুত্র ভৃগু। এক শান্ত-স্নিগ্ধ সকালে বাবার কাছে দাঁড়ায় জিজ্ঞাসু হয়ে। বিনীতকণ্ঠে প্রশ্ন, কে ব্রহ্ম? তাঁকে জানার জন্য আমাকে ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত করুন। বলুন ওই বিদ্যার কথা সবিস্তারে।

পুত্রের এই ব্যাকুলতা ভালো লাগে ঋষি বরুণের। এমন প্রশ্ন যে উঠবে এটা তিনি জানতেন। বরং আশা ছিল আরও অনেক আগেই এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। দেরি হলেও ভৃগু যে তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যার কথা জানতে চাইছে তাতেই বরুণ ঋষি হলেন আপ্তকাম। তাই সস্নেহে আচার্যের মতোই বলেন তিনি, অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাক্য হলো ব্রহ্মকে জানার-বোঝার মুক্ত দুয়ার।

ভৃগুর দুচোখে তখন দুকূল ভাসানো প্লাবনের মতো জিজ্ঞাসা। সে কথা বুঝতে দেরি হলো না ঋষি বরুণের। তাই বিশদ হন তিনি। জনম, যা থেকে এই জীবজগৎ সব কিছুর উদ্ভব হয় আবার সেই জাত বা উদ্ভূত বস্তু যাঁর দ্বারা জীবিত থাকে আবার আয়ু বা জীবনের মেয়াদ শেষ হলে যাঁর কাছেই ফিরে যায়, মিশে যায় তাঁকে জানার চেষ্টা করা। তিনিই ব্রহ্ম। অন্ন, প্রাণ, চোখ, কান, মন আর বাক্য দিয়েই জানা যায় তাঁকে। বোঝা যায় সব কিছু—ভিতর ও বাইরের। আর এসব জানলেই আসে জিজ্ঞাসা, এদের উৎপত্তি, স্থিতি বা লয় হয় কীসে? এই যে অনুসন্ধিৎসা বা কৌতূহল—তারই নাম ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায় তপস্যার মধ্য দিয়ে। তাই পুত্রকে বরুণ ঋষির উপদেশ, সত্যিই যদি ব্রহ্মকে

জানতে চাও তাহলে যাও তপস্যা করো।

ভৃগু ঋষিপুত্র। তাই তিনি বিলক্ষণ জানেন কথাটা। শুনে হয়তো শেখা যায়, কিন্তু তাতে পূর্ণকাম হওয়া যায় না। তার জন্য দরকার তপস্যার। তপস্যা না করলে প্রকৃত বুদ্ধির উন্মেষ হয় না। সেই সঙ্গে ঘটে না জ্ঞানের বিকাশ। সেই কারণেই আর কথা না বাড়িয়ে ভৃগু বসে গেলেন তপস্যায়। নির্জনে, একাগ্রচিত্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য।

চারপাশের সবকিছু ভুলে, ভৃগু মগ্ন গভীর ধ্যানে। সে কতকাল তা জানা নেই। তবে একসময় ধারণা হয় তাঁর, সফল হয়েছে তপস্যা। জেনেছেন তিনি ব্রহ্মকে। অনুভব করেছেন, অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ—ব্রহ্ম হলেন অন্ন।

মিলিয়ে দেখেন তিনি পিতা বরুণ ঋষির কথাগুলির সঙ্গে নিজের উপলব্ধিকে। সিদ্ধান্তে আসেন, এই বিশ্বের যাবতীয় সবকিছু যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, মৃত্যুতে বিলীন হয় যার মধ্যে, তিনিই ব্রহ্ম। আর সেই বস্তু হলো অন্ন। অন্ন থেকে জীবের জন্ম, প্রাণীর সৃষ্টি। জন্মের পর অন্ন খেয়েই বেঁচে থাকে এবং মৃত্যুতে মিশে যায় তাতে।

এই যে উপলব্ধি, তাতে কিন্তু তিনি তৃপ্ত হলেন না। তাই ফিরে এলেন পিতার কাছে। আবার সেই একই আবেদন, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন। সত্যই যাতে ব্রহ্মজ্ঞান ঘটে সেই পথ আমাকে দেখান।

পুত্রের ব্যাকুলতায় মনে মনে খুশিই হলেন বরুণ ঋষি। বুঝলেন পুত্রের ব্রহ্মকে জানার আকাঙ্ক্ষা কত গভীর। আর তাই স্পষ্ট ভাষাতেই বলেন--- বাছা, ব্রহ্মকে জানার একমাত্র সাধনপথ হলো তপস্যা। তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তপস্যার মাধ্যমেই ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানার চেষ্টা কর।

তাই করলেন ভৃগু। আবার তপস্যা নির্জনে। আবার উদ্ভাসিত হলো হৃদয়। সেই আলোকধ্যোয় হৃদয়েই জানলেন, 'প্রাণো ব্রহ্মেতি'— প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণশক্তি থেকেই সব কিছুর জন্ম। প্রাণ শক্তি নিয়েই বেঁচে আছে সকলে। মৃত্যুর পর সেই প্রাণের হয় বিলয়। এই বিশ্ব নিত্য বয়ে যাচ্ছে প্রাণের দুরন্ত প্রবাহে। এত যাঁর শক্তি, তিনি কি ব্রহ্ম না হয়ে পারেন?

সিদ্ধান্তে আসার পরও শান্ত হলো না হৃদয়। মিটল না পিপাসা। মনে হয় এটা শেষ জানা নয়। প্রাণের ক্রিয়া তো মুক্ত, স্বাধীন বা অব্যাহত নয়। তাছাড়া প্রাণের তো উৎপত্তি আছে, অন্তও আছে। তাহলে? সেই উত্তর জানতে তিনি ফিরে এলেন পিতার কাছে। আবারও সেই একই আর্তি—আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন।

পুত্রের অগ্রগতিতে খুশি পিতা। তাই আবারও বলেন, তপস্যাই ব্রহ্ম। তুমি তপস্যা কর। তপস্যার মধ্য দিয়েই জানো ব্রহ্মকে।

পিতার উপদেশ মতো আবারও তপস্যায় বসলেন ভৃগু। এবার উপলব্ধি—মনই ব্রহ্ম। কী অসাধারণ শক্তি মনের। এই বিশ্বের সব কিছুই গড়েছে মন। মন থেকে জন্ম, তাকে অবলম্বন করে সকলে রয়েছে নিশ্চিন্ত। আবার মৃত্যুতে মনেই স্থান পায় সকলে। এ বোধে হৃদয় হয় স্থির। কিন্তু কই তৃপ্ত তো হতে পারছেন না তিনি। তা হলে কী—এই সংশয় মুক্ত হতেই ভৃগু আবারও গেলেন বাবার কাছে। আবারও একই প্রার্থনা।

সাধনায় পুত্রের অগ্রগতি দেখে বরুণ ঋষি সত্যিই স্বস্তি অনুভব করেন। পুত্র যাতে যথার্থ ব্রহ্মকে জানতে পারে তারজন্য আবারও তিনি বলেন তপস্যাই ব্রহ্ম। তুমি তপস্যা কর। আরও একনিষ্ঠ হও, যাও।

ভৃগুর অন্তরে তখন তীব্র পিপাসা। তৃষ্ণা তাঁকে মেটাতেই হবে। তৃপ্তও হতে হবে। তাঁর তৃষ্ণার এই নিবৃত্তি যে ব্রহ্মকে জানার মধ্য দিয়েই মিটবে সে সম্পর্কে ভৃগু নিশ্চিত। তাই বাবার কথায় এতটুকু বিরক্ত বা বিচলিত না হয়ে তাঁরই নির্দেশকে অনুসরণ করেন ভৃগু। বরুণ ঋষির আদিষ্ট পথ তপস্যাকেই আঁকড়ে ধরলেন তিনি, আরও দৃঢ়ভাবে—আরও আন্তরিকভাবে—আরও পিপাসিত অন্তরে।

সেই তপস্যার মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝলেন, বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানই হলো ব্রহ্মকে জানার উপায়। বুদ্ধির বিকাশ না হলে বা বুদ্ধিতে স্থিত হতে না পারলে সবই তো অস্থির— কোনো বোধই হয় না সম্পূর্ণ। এই সিদ্ধান্তে আসার পর 'ব্রহ্মকে এবার দর্শন করবো' বোধে তপস্যার আসন ছাড়ার মুহূর্তে ভৃগুর মনে হলো, বুদ্ধিরও তো চাঁদের মতোই ক্ষয় আছে, বৃদ্ধিও আছে। তাহলে?

আবার প্রশ্ন? মনে হয়, এই জানাই তো শেষ জানা নয়। এরপরেও তো আছে। সেই অশেষকে না জানলে ব্রহ্মের উপলব্ধি তো সম্ভব নয়। তাই আবারও গেলেন পিতার কাছে—আগের চেয়ে অনেক আলোকিত এবং আরও বিনত জিজ্ঞাসু হিসেবে বলেন বাবাকে সব।

ভৃগুর সব কথাই ধীরভাবে শোনেন বরুণ ঋষি। অবশ্য শোনার আগেই পুত্রের তেজঃদীপ্ত আলোকমূর্তি দেখেই বুঝেছিলেন, ছেলে তাঁর ঠিক পথেই যাচ্ছে। কেবল যাওয়া নয়, সেই চলন বা গমনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মদুয়ারে প্রায় পৌঁছে গেছে পুত্র। পুত্রের এই অগ্রগতি দেখে পিতাও পুলকিত। কিন্তু নিজের মনের সব আবেগ, সব পুলককে চাপা দিয়ে আগের মতোই গম্ভীর ভাবে পুত্রকে বলেন, তপস্যা করো। তপস্যার

কোনো বিকল্প নেই—এটাই জেনো শেষ কথা।

অবনত মস্তকে পিতার নির্দেশিত পথেই আবার নির্জনে বাস। সবকিছু ভুলে আবার সেই তপস্যা। কেবল ব্রহ্ম আছে এই বোধে স্থির হওয়া নয়, সেই সঙ্গে বোঝেন, তিনি আছেন এবং তারই ইচ্ছায় জানা যাবে তাঁকে। 'তাঁরই' ইচ্ছার অপেক্ষায় ধ্যানমগ্ন হন ভৃগু ঋষি।

সহসা হৃদয় যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অযুত কোটি সূর্যের আলোর প্রবাহ তখন হৃদয়ে। সে প্রবাহে তিনি যেন ভেসে যেতে থাকেন, এবস্তু সেই আলোই যে তাঁকে আকর্ষণ করছে। কেবল ভেসে যাওয়া নয়, ওই আলোক প্রবাহে স্থিত হওয়ার এক অনির্বচনীয় আনন্দে নেচে উঠল অন্তর। যোজন-অন্ধকার পার হওয়ার পর আলোর সন্ধান পাওয়ার মতোই আনন্দে তিনি যেন বজ্রমুখর—আনন্দ—আনন্দই সব। আনন্দই ব্রহ্ম। আমি জেনেছি—জেনেছি সেই আনন্দময়কে। সেই জানার সহস্র সহস্র পুলকে শিহরিত ভৃগু তখন আত্মবোধ প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। সেই ভাবেই তিনি ছুটলেন পিতার কাছে।

ছুটলেন কথাটা বলা ভুল। তাঁর মনে হলো তিনি ছুটছেন, কিন্তু যে অনাস্বাদিত আনন্দের স্বাদটুকু তিনি পেলেন তাতে স্খলিত চয়ন তিনি। গদগদ তাঁর বাক্য। গমনেও আনন্দের বিদ্যুৎ ঝলক।

পুত্রের ওই রূপ দেখে পিতা বরুণও আনন্দস্রোতের টানে বাক্যহারা। দুহাত বাড়িয়ে সন্তানকে কেবল বুকে জড়িয়ে ধরতে চান তিনি। চাওয়া নয়—দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ হলেন পিতা-পুত্র। পুত্রের কথা শোনার আগেই সব বোঝা হয়ে গেছে তাঁর। তবুও সাগ্রহে মূক জিজ্ঞাসা — বলো—বলো পুত্র তোমার অনুভূতির কথা।

ভৃগু তখনও ভাসমান আনন্দ সঙ্গমে। তাঁর মুখও যেন রুদ্ধ কোনো অদৃশ্য বন্ধনে। তারই মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয় ক'টি কথা—'বাবা, আনন্দ—আনন্দই ব্রহ্ম। আমি জেনেছি সেই কথা। আনন্দ থেকেই উদ্ভব এই অখিল বিশ্বের সব কিছুর। প্রাণীরও উদ্ভব আনন্দ থেকেই। আনন্দই সকলের জন্মদাতা—স্রষ্টা। আনন্দ জনক—আনন্দই জননী। প্রাণী যতদিন এই পৃথিবীতে থাকছে, থাকবে এই আনন্দের মধ্যেই। আয়ু শেষে মৃত্যুর পর আবার সেই আনন্দেই মিলে মিশে যাচ্ছে সব। যেমন সমুদ্রে লীন হয় নুনের পুতুল অনেকটা সেই রকমই।

বাবাকে এই আনন্দের কথা বলতে গিয়ে ভৃগু নিজেও যেন আনন্দসাগরে ভাসমান। তিনি বুঝতে পারেন, মহাবলীয়ান আনন্দ আপন শক্তিতেই সৃজ্যমান। আনন্দসাগর লহরীর উত্থান ও পতন, তার ভঙ্গ-বিভঙ্গ—সবকিছুর মধ্যে অবস্থান এই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের। তিনি গড়ছেন। তিনি ভাঙছেন। অনেকের সেই ভাঙা-গড়ার খেলায় ধ্বংসের মধ্যেও ঘটছে আনন্দেরই প্রকাশ। যাকে মনে হচ্ছে ধ্বংস করা হচ্ছে তা আসলে স্থান পাচ্ছে ওই আনন্দস্বরূপ সৃষ্টির মধ্যেই। আনন্দই-আনন্দ। আনন্দই সত্য—নিত্য-শাশ্বত। এর ওপরে আর কেউ নেই। বিশ্বজুড়ে কেবল আনন্দেরই খেলা। আনন্দের এই মহাপ্রকাশ তাই তো প্রাণে জাগায় পুলক। মনে জাগায় ভয়। অথচ, এই পুলক এবং ভয়—দুই-ই ওই আনন্দময় ব্রহ্মেরই লীলারঙ্গের এক একটি তরঙ্গ। এইবোধ যখন দৃঢ় হয় তখনই শুরু হয় আনন্দময় ব্রহ্মের সন্ধান।

'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা' এই উপলব্ধিরই প্রকাশ পেল ভৃগুর কথায়। তিনি বলেন, আমি জেনেছি সেই সত্য, আনন্দো ব্রহ্মোতি ভজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দেই সব কিছুর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনয়।

ঋষি বরুণ বুঝতে পারেন, পুত্র তাঁর এখন ব্রহ্মবিৎ। সব জানার অবসান হয়েছে তার। তপস্যা বা সাধন এবং মননের মাধ্যমে এইভাবে অগ্রসর হতে হতে একসময় লক্ষ্য—তা যত উচ্চশিখরই হোক না কেন তাতে পৌঁছোনো যায় অর্থাৎ ব্রহ্মময় হওয়া যায়। এখানে পৌঁছোবার পর আর কিছু জানার থাকে না, অবসান হয় সব চাওয়া পাওয়ার। সব আকাঙ্ক্ষা-কামনা রহিত হয়ে তখন সদা বিহার করা যায় ব্রহ্মরূপ মহামানস সাগরে।

সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ ওই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর তপস্যা ,সেখানে পৌঁছাবার সোপান। তপস্যার মধ্য দিয়ে ভৃগু ঋষির এভাবে ব্রহ্মকে জানার কথা বা বিজ্ঞানকে তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ বিদ্যা সকলের জন্য। এ বিদ্যার মূলকথা, সব অহংকার বিসর্জন দিয়ে আন্তরিকভাবে তপস্যায় রত হওয়া। আর জানা সেই সত্যকে—ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—তাই আনন্দে থেকে অন্যকে আনন্দে রাখাই ভারত-সাধনা।

এই একই কথা শোনা গেছে মুণ্ডক উপনিষদেও। সেখানে জিজ্ঞাসু শৌনককে শুনিয়ে দিলেন গুরু আঙ্গিক এই একই কথা—মনোময়, প্রাণময় শরীরের অধিনেতা ব্রহ্মই বুদ্ধিকে হৃদয় অম্বরে প্রতিস্থাপিত করে অন্ন পরিপুষ্ট দেহে আনন্দরূপে বিশেষভাবে প্রকাশিত অমৃত রূপে এই আমাতেই।

লক্ষণীয়, কঠোর সাধনায় যা জেনেছিলেন ঋষিরা, সাধারণের মঙ্গলের জন্য তাই প্রকাশ করেছেন এই ভাবে। এই বিশ্বকল্যাণ বোধই সনাতন ধর্মের সার কথা। বৈশিষ্ট্যও । ▯

গণেশ পূজোর ইতিবৃত্ত

কানু রঞ্জন দেবনাথ

গণেশ নামটি একটি সংস্কৃত শব্দবন্ধ। সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় গণ + ঈশ = গণেশ। গণ শব্দের অর্থ হলো একটি গোষ্ঠী, সমষ্ঠি বা শ্রেণী এবং ঈশ শব্দের অর্থ হলো ঈশ্বর বা ভগবান বা প্রভু। সুতরাং গণেশ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সকল গণের ঈশ্বর বা প্রভু। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় জনগণের তন্ত্র (গণ + তন্ত্র = গণতন্ত্র) বা শাসনব্যবস্থা তেমনি গণেশকেও বলা যায় জনগণের ঈশ্বর। গণেশপুজো সাধারণত ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে হয়। এ বছর গণেশ পূজা ১৯ সেপ্টেম্বর এবং শেষ হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। দশ দিন ধরে চলে গণেশ পূজা।

গণেশ জগতের মানুষের মঙ্গল করেন বলে গণেশকে 'মঙ্গলমূর্তি'ও বলা হয়ে থাকে। তিনি বিনায়ক অর্থাৎ সমস্ত নায়কের অধিপতি। বিনায়কের আশীর্বাদে মানুষ সমাজের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। মহাদেব গণেশের এই নামকরণ করার সময় বলেছিলেন, ''হে পার্বতী! এই কুমার (গণেশ) আমার মতো নায়ক ছাড়াই পুত্ররূপে জন্ম হয়েছে, অতএব ওর নাম 'বিনায়ক' নামেই জগৎ সংসারে বিখ্যাত হবে। তিনি সংকটমোচন দেবতা। গণপতির আরাধনা করলে সমস্ত সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জানা যায় গণেশের জনপ্রিয়তা শুধু হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বৌদ্ধ ধর্মেরও দেবতা বিনায়ক। তিব্বত, চীন, শ্রীলঙ্কা ও জাপানেও পূজিত হন গণেশ।

গণেশের দ্বাদশ নামাক্ষর জপে দূর হয় বাধা বিপত্তি— 'সুমুখশ্চৈকদন্তশ্চ কপিলোগজকর্ণকঃ ।লম্বোদরশ্চ বিকটো বিঘ্ননাশো বিনায়কঃ।। ধুমকেতু গণাধ্যক্ষো ভালচন্দ্রো গজাননঃ ।দ্বাদশৈতানি নামানি যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি ।। বিদ্যাংরম্ভ বিবাহে চ প্রবেশ নির্গম তথা। সংগ্রামে সংকটে চৈব বিঘ্নস্তস্য ন জায়তে।। অর্থাৎ সুমুখ, একদন্ত, কপিল, গজকর্ণ, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্ননাশক, বিনায়ক, ধুম্রকেতু, গণাধ্যক্ষ, ভালচন্দ্র ও গজানন — যারা বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, গৃহপ্রবেশে, সংগ্রাম বা সংকটের সময় গণেশের এই বারোটি নাম জপ কিংবা পাঠ করেন, তাদের জীবনে কোনো ধরনের বিঘ্ন আসে না।

গণেশের জন্মবৃত্তান্ত—পুরাণ অনুসারে, কৈলাশে একদিন মাতা পার্বতী একাই রয়েছেন। নন্দীকে মায়ের পাহারায় রেখে শিব ও ভৃঙ্গি একটা জরুরি কাজে কৈলাশের বাইরে গিয়েছেন। এক সময় মা পার্বতী এসে নন্দীকে ডাকতে থাকে। নন্দী চমকে উঠে এক দৌড়ে মায়ের কাছে আসে। পার্বতী বললেন, ''শোন নন্দী, আমি এখন স্নান করতে যাবো। কেউ যেন এদিকে না আসে। যতক্ষণ না আমি স্নান শেষ করে না আসি ততক্ষণ তুই এখানে পাহারায় থাকবি । কাউকে ঢুকতে দিবি না।'' যথা আজ্ঞা বলে নন্দী গুহার দ্বারে বসে পড়লো। মাতা পার্বতী নিশ্চিন্তে ভিতরে ঢুকলেন স্নান করতে। বেশ কিছুক্ষণ পরে নন্দী ক্লান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছে। এমন সময় হঠাৎ শিব এসে উপস্থিত হলেন। নন্দী ধড়ফড় করে উঠে দেখল শিব ভিতরে ঢুকছেন। মায়ের আদেশ পালনের জন্য নন্দী শিবকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিল। কিন্তু শিব নন্দীর কথা না শুনে জোর করে ভিতরে ঢুকে গেলেন। শিবের এমন আচরণে পার্বতী ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি শিবের সঙ্গে কথা বললেন না। বাধ্য হয়ে শিব তখনকার মতো চলে গেলেন। পার্বতী তাঁর শরীরের হলুদ মাখা ময়লা দিয়ে একটি সুন্দর পুতুল তৈরি করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। পার্বতীর হাতে গড়া মাটির পুতুলের মাধ্যমে জন্ম হল সিদ্ধি বিনায়ক গণেশের। তারপর সেই সুদর্শন পুতুল পুত্র গণেশকে দ্বার রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে দেবী ভিতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে শিব তাঁর ভুল বুঝতে পেরে দেবীর মান ভাঙানোর জন্য আবার পার্বতীর কাছে গেলেন, কিন্তু এবার সেই বালক তাঁকে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দিল না। এবার শিব রেগে গেলেন। গণেশও ছাড়বার পাত্র নন। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। এই ছোট্টো বালকের তেজ ও বীরত্বের কাছে একে একে সব দেবতা পরাজিত হলো।

শিব এবার প্রচণ্ড রেগে তাঁর ত্রিশূল দিয়ে বালকের মাথা কেটে ফেললেন। এই ঘটনায় পার্বতী প্রচণ্ড রেগে গেলেন , এই সৃষ্টিই তিনি আর রাখবেন না। সব কিছুই তিনি ধ্বংস করে দেবেন। সব দেবতা মিলে তাঁকে

অনেকভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেও কোনো ফল হলো না। মাতা পার্বতীকে কেউই শান্ত করতে পারলেন না। শেষে শিব এসে দেবী পার্বতীকে বললেন, ''শান্ত হও দেবী, তুমি কী চাও বলো? আমি তোমার সব ইচ্ছা পুরণ করবো।'' পার্বতী বললেন, ''এই মুহূর্তে তুমি আমার পুত্রের জীবন দান করো। আর তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো।'' উপায়ন্তর না দেখে শিব বললেন, ''তথাস্তু, তোমার পুত্র এক্ষুনি জীবিত হয়ে উঠবে।''

শিবের বরে গণেশ জীবিত হয়ে উঠলো কিন্তু সমস্যা হলো তাঁর মাথা নিয়ে। রাগে অন্ধ হয়ে শিব তো তার মাথাটাই কেটে ফেলেছেন, ফলে মাথা ছাড়াই পার্বতী পুত্র জীবিত হলো। পার্বতী আরও রেগে গেলেন। তিনি বললেন, ''যে ভাবেই হোক আমার পুত্রের সম্পূর্ণজীবন চাই। এমন মাথাকাটা ছেলে আমার ছিল না''।

শিব আবার বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন। গণেশের মাথা খুঁজে আনার জন্য তাঁর সহচরদেরকে চারদিকে পাঠালেন। কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্য- পাতালের সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই মাথা পাওয়া গেল না। শেষে শিব বললেন, ''তোমরা উত্তর দিকে যাও। পথে যেতে যেতে যাকে প্রথম দেখবে যার মা পিছন ফিরে বসে আছে, তার মুণ্ড নিয়ে এসো।''

শিবের নির্দেশে সকলে উত্তর দিকে গিয়ে প্রথমে একটা হাতি দেখতে পেল যার মা পিছন ফিরে বসে আছে। সেই হাতির মুণ্ড কেটে নিয়ে এল। শিব গণেশের মাথায় সেই হাতির মুণ্ড বসিয়ে দিলেন। শিব তাকে নিজের পুত্র বলে স্বীকার করে নিলেন। সেই দিন মর্ত্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে গণেশ পূজা আরম্ভ হলো।

বিভিন্ন পুরাণে গণেশের জন্ম নিয়ে অনেক কাহিনি বর্ণিত আছে। এইসব কাহিনি থেকে আমরা গণেশের জন্মবৃত্তান্তের কথা জানতে পারি। বিভিন্ন পুরাণ গণেশের জন্মবৃত্তান্তকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলেও শিবপুরাণে বর্ণিত কাহিনিটিই বেশ চমকপ্রদ ও সুন্দর।

গণেশের মাথা হাতির মতো কেন এই নিয়ে গণেশের জন্মবৃত্তান্তের মাঝেই বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আরেকটি কাহিনি আছে। যেমন পার্বতীর কোলে গণেশ আসার পর সমস্ত দেবদেবী তাঁকে দর্শন করে আশীর্বাদ দিয়ে যান। কিন্তু শনিদেব সেখানে উপস্থিত থেকেও গণেশের দর্শন করে আশীর্বাদ করেননি। পার্বতী অনেক অনুরোধ করেন শনিদেবকে। কিন্তু শনিদেবের উপর তাঁর স্ত্রীর অভিশাপ ছিল, তিনি যার দিকেই তাকাবেন তার মস্তক আলাদা হয়ে যাবে শরীর থেকে। পার্বতী একথা জানতেন না। পার্বতী অনেক করে বলাতে শনিদেব গণেশের দিকে দৃষ্টি দিলে সঙ্গে সঙ্গে গণেশের মাথা শরীর থেকে উড়ে যায়। পার্বতী সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। শেষে ভগবান বিষ্ণু হস্তীশাবকের মাথা নিয়ে এলে গণেশের দেহে তা স্থাপন করলে গণেশের পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণেশের পূজা কেন সবার আগে করা হয়?

হিন্দুধর্মের প্রচলিত রীতি অনুসারে সমস্ত পূজার আগে গণেশ পূজা করতে হয়। শুধু তাই নয়, বাড়িতে বা কর্মস্থলে কোনো শুভ মুহূর্তে গণেশকেই সর্বাগ্রে স্মরণ করা হয়। তাই আমাদের অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে গণেশের পূজা কেন সবার আগে করা হয়? এই বিষয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনি আছে। একবার স্বর্গে দেবতাদের সভা বসেছিল এবং প্রসঙ্গ উঠেছিল কে শ্রেষ্ঠ বা কার পূজা সবার আগে করা উচিত। তখন সকল দেবতাই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। তাই এর সঠিক নিষ্পত্তি হচ্ছিল না। এই নিয়ে দেবতাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে নারদ মুনি এসে সবাইকে এ ব্যাপারে মহাদেবের শরণাপন্ন হয়ে এই সমস্যার সঠিক সমাধান পেতে পরামর্শ দিলেন।

নারদ মুনির কথা শুনে সমস্ত দেবতা তখন শিবের শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের মধ্যে এই ঝগড়া এমনিতে মিটবে না দেখে শিব একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। মহাদেব বললেন, ''যে দেবতা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিলোক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজ নিজ বাহনে ঘুরে বা পরিক্রমা করে সবার আগে এসে আবার এই স্থানে বা আমার কাছে পৌঁছবেন তিনিই হবেন শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর পূজাই আগে হবে।''

এরপর সকল দেবতাই নিজ নিজ বাহনে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিলোক পরিভ্রমণ করতে চলে গেলেন। কিন্তু গণেশ ভারী শরীরে নিজ বাহন ইঁদুর-সহ রইলেন অনেক অনেক পিছনে। কিন্তু তিনি সাহস হারালেন না। এমন সময় গণেশ ঠাকুরের মনে হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা ত্রিলোক তো মাতা-পিতাই। কাজেই মাতা-পিতার চারদিক ঘুরে এলেই তো ত্রিলোক পরিক্রমা হয়ে যায়। তাই তিনি ওখান থেকে সোজা নিজের মাতা-পিতার কাছে চলে গেলেন এবং তাঁদের চারিদিকে ঘুরে এসে নিশ্চিন্তে বসে বসে লাড্ডু খেতে লাগলেন।

সবার আগে কার্তিক তাঁর ময়ুরে চড়ে দ্রুতগুতিতে ত্রিলোক পরিক্রমা করে এসে দেখতে পেলেন গণেশ বসে বসে লাড্ডু খাচ্ছেন। তাই দেখে কার্তিক ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, ''আমি সবার আগে ত্রিলোক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসেছি; অথচ গণেশ এখানে বসে বসে লাড্ডু খাচ্ছে, এটা কেন হবে? লাড্ডু খেলে আগে আমি খাব। তখন গণেশ দেবতাদের সামনে যুক্তি দিলেন, ত্রিলোকের সকল সুখ সম্পদ মাতা-পিতার চরণে বিরাজমান। মাতা-পিতার চরণেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা ত্রিলোক রয়েছে। তাছাড়া মাতা-পিতার সেবাই সর্বোত্তম সেবা। যেহেতু আমি আমার মাতা-পিতার চারিদিক পরিক্রমা করেছি, কাজেই আমিই সবার আগে ত্রিলোক পরিক্রমা করেছি এবং এই অর্থে আমিই প্রথম হয়েছি। তাই আমি লাড্ডু খাচ্ছি। তাঁর এই যুক্তি মেনে নেন স্বয়ং মহাদেবও। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য সেই থেকেই অগ্রপূজ্য হয়ে উঠেন গণেশ। □

ফঃ ৫

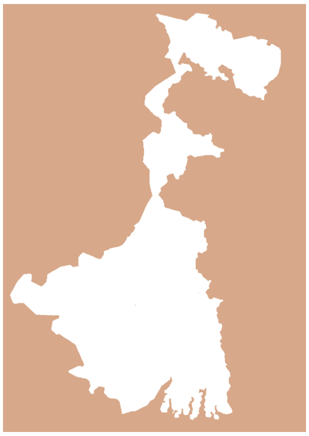

পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা

সুজিত রায়

রাজ্য সরকারের অপদার্থতা এবং প্রায় সার্বিক প্রশাসনিক স্তরে চরমতম ব্যর্থতা, শাসকদলকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারি বদান্যতায় চরমতম দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং স্তাবকগোষ্ঠীসমূহ গড়ে তোলার অপচেষ্টা, বিরোধী দলগুলিকে ক্রমাগত অন্যায়ভাবে কোণঠাসা করে রাখা ও মাথা তুলতে না দেওয়া এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার নতুন রেকর্ড সৃষ্টি-সহ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর হাস্যকর ভূমিকার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে যখন বিদ্রোহের আবহাওয়া ঘন হচ্ছে, তখনই ওই সরকারি প্রচেষ্টাতেই একটি নতুন বিতর্ক তুলে ধরে জলঘোলা করা শুরু হয়েছে এবং মানুষের নজর ঘোরাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তা হলো পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস তথা পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা।

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী গত ১২ বছরের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে কখনও রা কাড়েননি। তার আগে ৩৫ বছরের বামফ্রন্টের শাসন, কংগ্রেসের পাঁচ বছরের শাসন, যুক্তফ্রন্টের তিন বছরের শাসন এবং তারও আগে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের ১৬ বছরের শাসনে কখনও পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। যদিও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস নির্দিষ্টদিনে ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতে পালন করার প্রচলন রয়েছে।

মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গের পৃথকভাবে কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস নির্ধারিত হয়নি। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পৃথকীকরণ হলেও, পরবর্তীকালে প্রায় ৯ বছর ধরে আঞ্চলিক সীমা নির্ধারণ এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের সঙ্গে এলাকার হাতবদলের পালা চলেছিল। যেমনটা হয়েছিল পঞ্জাবেও। বঙ্গ যেমন ভাগ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ হিসেবে, তেমনই পঞ্জাবও দু' টুকরো হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাবের একটি করে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবে বঙ্গ ভাগ নিয়ে বিতর্ক যতখানি জটিলতর রূপ নিয়েছিল, পঞ্জাব ভাগ নিয়ে তত বিতর্ক হয়নি।

বঙ্গ ভাগের ইতিহাস

বঙ্গ ভাগের ইতিহাসের সন্ধানে ফিরে যেতে হবে ১৯৪৭ সালে, যখন মুসলিম লিগ মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-বিভাজনের পক্ষে তীব্র সওয়াল করলেও বাঙ্গলাকে অবিভক্ত রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী। সুরাবর্দির এই উদ্যোগ কখনই হিন্দু বাঙ্গালিদের স্বার্থ ভেবে করা হয়নি। তিনি কৌশলে বাঙ্গলাকে অবিভক্ত রেখে একটি মুসলমান-প্রধান পৃথক দেশ গঠন করতে চেয়েছিলেন যা কালক্রমে পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাবে। জিন্না তাই সুরাবর্দিকেই সমর্থন করেছিলেন, কারণ বাজপাখির মতো তাঁর শ্যেনদৃষ্টি ছিল সমগ্রবঙ্গের ওপর এবং অনেক আগেই প্রকাশ্যে বলেছিলেন, যদি কলকাতাকে না পাই তাহলে পাকিস্তান দেশ সম্পূর্ণতা পাবে না। তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল একটাই— হিন্দু বাঙ্গালিদের পাকিস্তানের অধীনে এনে ধর্মান্তরিত অথবা বাধা দিলে হত্যা করে বিলুপ্তপ্রায় জনজাতিতে পরিণত করে দেওয়া।

সুরাবর্দি ও জিন্নার এই সুগভীর চক্রান্তটা বুঝতে ভুল করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায়। তাঁরা ভেবেছিলেন ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান বা সংযুক্ত বঙ্গ পরিকল্পনা সব ধর্ম সব বর্ণের মানুষকে এক ছাতার তলায় আদর্শ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

১৯৪৭-এর ৯ মে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলেন। ১০ মে সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে বৈঠক বসল। যদিও জওহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল সুরাবর্দি ও জিন্নার যৌথ পরিকল্পনার চাবিকাঠিটি ধরতে পেরেছিলেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন— বঙ্গ ভাগ হোক। মুসলমানরা যাক পূর্ববঙ্গে বা যুক্ত হোক পাকিস্তানের সঙ্গে। এপার বঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুরা থাকুক। পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হোক ভারতবর্ষের সঙ্গে। বাঙ্গালি হিন্দুরাও সেটাই চাইছিলেন। কারণ, তাঁদের মনে তখনও দগদগে ঘা হয়ে রয়েছে ১৯৪৬-এর নোয়াখালি ও কলকাতা নরসংহারের স্মৃতি এবং সেই দাঙ্গায় সুরাবর্দির ভূমিকা। তাঁরাও সমস্বরে অবিভক্ত বঙ্গদেশ গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পথে নেমেছিলেন।

সুরাবর্দির কুমতলবটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন তিনি প্রস্তাব রাখেন স্বাধীন বঙ্গদেশের নির্বাচকমণ্ডলী হবে হিন্দু ও মুসলমান— এই দুইভাগে বিভক্ত অর্থাৎ সংখ্যাধিক্যের জোরে মুসলমানি বাঙ্গলা রাজত্ব কায়েম করা। এই সময়েই তৎপর হয়ে ওঠেন হিন্দু মহাসভার অবিসংবাদী মানবতাবাদী নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১২ মে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সোদপুরে দেখা করেন এবং বঙ্গ ভাগের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। প্রতিষ্ঠা করেন বাস্তবতার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ স্থাপনের যৌক্তিকতা। শ্যামাপ্রসাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত বক্তা ও রাজনীতিবিদ নির্মল চ্যাটার্জি। গান্ধীজীও শ্যামাপ্রসাদের যুক্তিকে নস্যাৎ করতে পারেননি। কারণ তিনিও

শ্যামাপ্রসাদের মতোই প্রত্যক্ষ করেছেন নোয়াখালির এবং কলকাতার হিন্দু নরসংহার। স্বচক্ষে দেখেছেন, কী নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে হিন্দুদের। হিন্দু মহল্লা কীভাবে আগুনে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়েছে। কীভাবে মহিলাদের ধর্ষণ করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং পরে জোর করে মুসলমান পরিবারের বউ করা হয়েছে। কীভাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবারগুলি জমিজমা, টাকা পয়সা, সোনাদানা, ঘরবাড়ি সবকিছু মুসলমান লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। অতএব শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন এগিয়ে এলেন বিতর্কের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য।

তিন পর্যায়ে ভোটাভুটিতেই সিদ্ধান্ত

মাউন্টব্যাটেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, বঙ্গ ভাগ হবে কিনা তা ঠিক হবে তিনটি পর্যায়ে বিধিসম্মত ভোটাভুটির মাধ্যমে।

১। প্রথম ভোটাভুটি হবে বিধান পরিষদে।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোট দেবে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা।

৩। তৃতীয় পর্যায়ে ভোট দেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা।

এই তিনটি পর্যায়ের ভোটেই যদি সব পক্ষই চায় বঙ্গ অবিভক্ত থাকুক, তাহলে বঙ্গ ভাগ হবে না। কিন্তু কোনো একটি পর্যায়েও যদি বঙ্গ ভাগের পক্ষে ভোট বেশি পড়ে, তাহলে বঙ্গ ভাগ হবে।

প্রথম পর্যায়ে বিধান পরিষদের দুটি ভাগের একটি সম্মিলিত অধিবেশনে ভোটাভুটি হয়। ভোটে খুব স্বাভাবিকভাবেই রায় পড়ে অবিভক্ত বঙ্গের পক্ষে, কারণ দুটি কক্ষের সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল মুসলমানদের। ফলত অবিভক্ত বঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ১২০টি এবং বিপক্ষে ভোট পড়ে ৯০টি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা ভোটাভুটিতে অংশ নেন। অবিভক্ত বঙ্গের প্রস্তাব এখানেও জয়ী হয়। ১০৬টি ভোট পড়ে প্রস্তাবের পক্ষে। ৩৫টি ভোট পড়ে বিপক্ষে।

তৃতীয় পর্যায়ে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধিদের বৈঠক। এই বৈঠকে সুরাবর্দির সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৫৮ জনই চান— বঙ্গ ভাগ হোক দু'ভাগে। পশ্চিমবঙ্গ পৃথক রাজ্য হিসেবে যোগ দেবে ভারতবর্ষে। অতএব মাউন্টব্যাটেন ভোটের শর্ত মেনে বাতিল করে দেন অবিভক্ত বঙ্গের প্রস্তাব। কারণ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়েছিল মাত্র ২১টি। যেদিন এই বঙ্গ ভাগের প্রস্তাব চূড়ান্ত হয় সেটি ছিল ২০ জুন ১৯৪৭।

ঠিক এই ঐতিহাসিক কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ২০ জুন তারিখটিকে মান্যতা দিয়েছিল। একথাও ঠিক, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসগতভাবে ভুল নয়।

রবীন্দ্রনাথ কী চেয়েছিলেন?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালির রাখিবন্ধন দিবসের সূচনায় ১৯০৫-এর অক্টোবর মাসের শুরুতে একটি বিবৃতি প্রচার করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল-সহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে লেখা হয়েছিল :

বঙ্গপ্রদেশে রাখিবন্ধন

"আগামী ১৬ অক্টোবর, ৩০ আশ্বিন, সোমবার আইন দ্বারা আমাদের বঙ্গপ্রদেশ বিভক্ত হইবে। আসুন, আমরা ওই দিনকেই আমাদের সমস্ত বাঙ্গালির ঐক্যবন্ধনের দিন করি। ওই দিনে আমরা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূতায় ঘরে ঘরে অথবা প্রকাশ্যস্থলে সম্মিলিত হইয়া, রাখীবন্ধন করিয়া, আমাদের অখণ্ড ভ্রাতৃভাব সকল বাঙ্গালি মিলিয়া প্রকাশ করি। এই শুভ বন্ধনের দায়িত্ব কামনায় ওইদিন আমরা সংযম গ্রহণ করিব। ওইদিন সমস্ত বঙ্গপ্রদেশের কোথাও কোনো গৃহে রন্ধন হইবে না। আমরা বাঙ্গালিরা সেদিন উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিব না। বনভোজনের চারণের ন্যায় চিড়া, মুড়কি, ফলাদি আহার করিয়া থাকিব। ওই দিনটিকেই প্রতি বৎসর বাঙ্গালির রাখী-বন্ধনের দিন করিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখিব। আশা করি, বঙ্গের জমিদার-সম্প্রদায় প্রজাদিগকে, গ্রামের প্রধানেরা গ্রামবাসীদিগকে, বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে তাহাদের প্রতিবেশিদিগকে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়া, যাহাতে বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে জাতীয় ঐক্যবন্ধনোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, অবিলম্বে তাহার আয়োজন করিবেন।"

সুরাবর্দি ও জিন্নার এই সুগভীর চক্রান্তটা বুঝতে ভুল করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায়। তাঁরা ভেবেছিলেন ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান বা সংযুক্ত বঙ্গ পরিকল্পনা সব ধর্ম সব বর্ণের মানুষকে এক ছাতার তলায় আদর্শ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এই প্রচারপত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে আরও একটি তারিখ পাওয়া যাচ্ছে— তা হলো ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ যেদিন বঙ্গবিভাগ আইনগতভাবে সিদ্ধ বলে পরিগণিত হয়েছিল। এটিও একটি ইতিহাসসম্মত তারিখ এবং হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-সহ সর্বধর্মের বাঙ্গালিকে মিলনোৎসব হিসেবে দিনটিকে পালনের ডাক দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা। এখন রাখিপূর্ণিমা হিসেবে একটি বিশেষ তিথিতে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, ১৬ অক্টোবরই হোক রাখিবন্ধন দিবস। তা এখনও কোথাও কোথাও মানা হলেও, সর্বত্র মানা হয় না। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো— ১৬ অক্টোবরকেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে মেনে নেওয়া অন্যায় কিছু হবে না।

যুক্তিসম্মত দাবি ১ নভেম্বর ১৯৫৬

ইতিমধ্যে আরও একটি যুক্তিসম্মত দাবি উঠে এসেছে। তা হলো ২০ জুন ১৯৪৭ বা ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ নয়, পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তারিখটি হলো ১ নভেম্বর ১৯৫৬।

দাবিদারদের যুক্তি হলো, পয়লা বৈশাখের কোনোমতেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেব মেনে নেওয়া উচিত হবে না, কারণ, ওই দিনটির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্থাপনার কোনও ঐতিহাসিক সমর্থনজ্ঞাপক তথ্য নেই। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে মেনে নেওয়া কোনো সার্থকতা নেই, কারণ, আরও দুমাস পরে ১৬ অক্টোবর আইনগতভাবে সিদ্ধ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ নামে রাজ্য স্থাপনার। ওই দিনটিকেও দাবিদাররা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবমতো পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মর্যাদা দিতে রাজি নন, কারণ তখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির সম্পূর্ণ এলাকা সুনির্দিষ্ট হয়নি। সীমারেখা নিয়ে ছিল বিস্তর পার্থক্য। আর ২০ জুন ১৯৪৭ তারিখটিকেও কোনো প্রাধান্য দেওয়া যাবে না কারণ, বঙ্গ ভাগ হবে বলে সিদ্ধান্তটি ওইদিন পাকাপাকি হলেও, নদীয়া, খুলনা, যশোর, মালদা ও মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের অধীনেই থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত তখনও চূড়ান্ত হয়নি। ১৯৪৭-এর ১৭ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের যে মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়।

কারণ ওই মানচিত্রের হিসেবে মুসলমান অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ পূর্ববঙ্গে আসার কথা ছিল। হিন্দু অধ্যুষিত খুলনাকে পূর্ববঙ্গে পাঠানো হচ্ছিল। বনগাঁ অঞ্চলটি যশোর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয় এপারে। আর নদীয়ার কুষ্টিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওপারে। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার কোচবিহার ও পুরুলিয়া কারা পাবে— পশ্চিমবঙ্গ না পূর্ববঙ্গ তা তখনও পর্যন্ত ছিল অনিশ্চিত। ১৯৪৭-এর আগস্টের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান দুটি অংশ— দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে কোনো যোগাযোগের রাস্তা ছিল না। কারণ মাঝখানে প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়েছিল বিহারের পূর্ণিয়া জেলা। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া তখনও পর্যন্ত বিহারের অধীন। অথচ পুরুলিয়ার মানুষ চাইছিল পশ্চিমবঙ্গের অধীনে আসতে। তার জন্য জোরালো আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। আঞ্চলিক রাজার অধীন কোচবিহারের ভারতভুক্তি হয়েছিল ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে। কিন্তু ১৯৫০ সালে ১ জানুয়ারির আগে সিদ্ধান্ত হয়নি যে, কোচবিহার হবে পশ্চিমবঙ্গের একটি সীমান্ত জেলা। চূড়ান্ত অদলবদলের পর পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণ মানচিত্র প্রকাশিত হয় ১৯৫৬-এর ১ নভেম্বর। সেদিনই পুরুলিয়া বিহারের মানভুম থেকে পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়। আর বিহারের পূর্ণিয়া থেকে কিষানগঞ্জের একটি বড়ো অংশ উত্তর মালদায় যুক্ত হয়ে রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণের জেলাগুলিকে যুক্ত করে।

সুতরাং এই ভাগাভাগির পরিপ্রেক্ষিতে একদল গবেষক দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৬-এর ১ নভেম্বর যেদিন পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ মানচিত্র প্রকাশিত হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মর্যাদা ওই ১৯৫৬-র ১ নভেম্বরেই দেওয়া উচিত।

স্তাবকবাহিনী যা চাইছেন

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে— পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে দাবিদার একাধিক তারিখ যেগুলির পিছনে রয়েছে ঐতিহাসিক বাস্তবতা। সেগুলি হলো ২০ জুন ১৯৪৭, ১৬ অক্টোবর ১৯০৫, ১ নভেম্বর ১৯৫৬। আরও দুটি দিনের প্রসঙ্গ যে এসে পড়েছে সেই ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ এবং পয়লা বৈশাখ--- এই দুটির সঙ্গে ইতিহাসের কোনো যোগাযোগ নেই।

যেমন ইতিহাসের কোনো যোগাযোগ নেই আরও একটি তারিখের যেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্ববাংলা হিসেবে সরকারিভাবে ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্ববাংলা দিবসকেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মর্যাদা দেওয়া দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্তাবকবাহিনীর কেউ কেউ। ওঁদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত গুণী শিল্পী শুভাপ্রসন্ন এবং দুই বঙ্গের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। এদের দাবির পিছনে কোনো ইতিহাসসম্মত যৌক্তিকতাকে তুলে ধরা হয়নি। শুধুমাত্র স্তাবকতা করতেই তাঁরা একটি সাম্প্রতিক সভায় এই প্রস্তাব রেখেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন— মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের নব নামকরণ 'বিশ্ববাংলা'কে নামের মাধ্যমেই গোটা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। গোটা বিশ্ব আজ বঙ্গকে চেনে একডাকে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়— বিশ্ববাংলা পশ্চিমবঙ্গের নতুন নাম হলো কবে বা কীভাবে, তার উত্তর কি দিতে পারবেন এই দুই গুণী মানুষ? পারবেন না। কারণ এরকম কিছু ঘটেনি। 'বিশ্ববাংলা' শব্দটি একটি লোগোমাত্র এবং তা রাজ্যের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর বাণিজ্যকরণের স্বার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তার বাইরে 'বিশ্ববাংলা'--- খায় না মাথায় দেয়, তা রাজ্যবাসীর জানা নেই। হয়তো জানা নেই বহু নেতা ও মন্ত্রীরও। সবাই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নেই। কারণ পশ্চিমবঙ্গ দিবস নির্ধারণে মুখ্যমন্ত্রীই শেষ কথা বলবেন তা স্বতসিদ্ধ। বাকি সকলের মতামতই এলেবেলে হয়ে যাবে।

শেষ কথা

এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হবে, ততদিনে হয়তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সিদ্ধান্তের পিছনে ঐতিহাসিক বাস্তবতা থাকবে কিনা তা শুধু সময়ই বলবে।

যেমন সময়ই বলবে— পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সংগীত হিসেবে নির্ধারিত হবে কোন গানটি। এটি নিয়েও ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বালার মাটি বাংলার জল' গানটির মধ্যে বাংলা শব্দটির বদলে বাঙ্গালি শব্দটি ব্যবহার করতে চান— কারণ বাংলা এখন শুধু বাঙ্গালির নয়, গোটা বিশ্ববাসীর। এটা নিয়ে যারা আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁদের থাবড়ে বসিয়ে দিয়েছেন স্তাবককুল। কারণ ওই 'বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ।' পারিষদরা সমস্বরে বলেছেন— 'আপনি ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। রবীন্দ্রনাাথের 'ভাষা প্রয়োজনে আপনি পরিবর্তন করতেই পারেন।' উপর্যুপরি এক প্রখ্যাত দেশখ্যাত প্রয়াত সম্পাদক তনয় আরও এক পা এগিয়ে বলেছেন— 'দিদি আপনি যথেষ্ট দক্ষ সংগীত রচয়িতা, সুরকার। অতএব পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সংগীতটি আপনি নিজেই রচনা করুন এবং সুর দিন। সেটাই মানুষ সাদরে গ্রহণ করবে।'

কি হবে তা বলতে পারব না। এ লেখা প্রকাশের আগে হয়তো সে গান লেখা হয়ে যাবে। সুরারোপ হয়ে যাবে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তা গেয়ে শুনিয়েও দেবেন। তারপর পাড়ার মোড়ে মোড়ে, অলিতে গলিতে, হাটে বাজরে সোৎসাহে বাজানো হবে সেই রাজ্য সংগীত। স্তাবকেরা হাততালি দিয়ে বলবেন— 'আহা! আহা!' □

স্ট্রবেরি চাষে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলে তাদের ভালো চাকরি লাভের আশা অভিভাবকরা করে থাকেন। বিবেক দুবের অভিভাবকরাও ঠিক এইরকম কিছুই প্রত্যাশা করেছিলেন। অভিভাবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত মূল্য সহকারে তাদের স্বপ্নপূরণ করে বিবেক এমসিএ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছু দিন চাকুরিরত ছিলেন। কিন্তু মাটির সঙ্গে গভীর টান অনুভব করার দরুন চাকুরি ছেড়ে একদিন নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। বিবেক তাঁর আত্মীয়দের জানান যে তিনি কৃষিকাজে আগ্রহী। তাঁর বাবা প্রাক্তন সেনানী অশোক কুমার দুবে ও মা অমরাবতী দেবী এই কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যান। কিন্তু তাঁর প্রতি বাবা-মায়ের পূর্ণ আস্থা ছিল। যে কাজই বিবেক করুক, সে সফল হবে এই বিশ্বাস তাঁর অভিভাবকদের ছিল। এই বিশ্বাসের কারণে বিবেকের আত্মবিশ্বাস অনেক গুণ বেড়ে যায়। এর পরিণতিস্বরূপ বিবেক আজ কৃষিকাজের মাধ্যমে প্রতি মাসে বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করেন এবং আরও প্রায় ৫০ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

বিবেক ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার মেদনী প্রখণ্ডের বারালোটা গ্রামের অধিবাসী। কৃষিকাজের জন্য বিবেক পালামৌয়ের অতি নকশাল প্রভাবিত নাওয়া বাজার প্রখণ্ডের কোণ্ডাগাঁওতে ৫ একর জমি পাট্টা নেন। এরপর তিনি এই জমিতে নতুন ধরনের কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্ট্রবেরি চাষ শুরু করলেন। চাষের কাজ শুরুর আগে বিবেক স্ট্রবেরি চাষ সংক্রান্ত পড়াশোনা করেন। তারপর তাঁর বন্ধু প্রবীণ সিংহের সঙ্গে কৃষিকাজ শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের পরিশ্রমের ফল ফলতে শুরু করলো। স্ট্রবেরি চাষ করে মিললো আশাতীত সাফল্য।

তারপর দুই বন্ধু মিলে কৃষিকাজের পরিধি বিস্তৃত করতে শুরু করলেন। বর্তমানে দু'জন প্রায় ৩৫ একর জমিতে চাষাবাদ করছেন। স্ট্রবেরির সঙ্গে থাইল্যান্ড জাত পেয়ারা, সোনালি রঙের আতা, ব্ল্যাক রাইস-সহ আরও কিছু মরশুমি ফসল তাঁরা চাষ করছেন। এই কৃষিকাজকে বিবেক একটি শিল্পোদ্যোগের রূপদান করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বিবেক জানান 'প্রথম দিকে তাঁদের বেশ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সঠিক পদ্ধতি ও দিশার অভাবে ক্ষেতের ফসল হয় নানা কীট-পতঙ্গ দ্বারা নষ্ট হয়।

এই বিষয়ের অধ্যয়নের দ্বারা এই সমস্যার সমাধানের পর ফসলের উপযুক্ত বাজার ও কৃষিশ্রমিক সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই। কিন্তু বেশ তাড়াতাড়িই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়। ধীরে ধীরে সমাজের বহু লোক বাড়িয়ে দেন সহযোগিতার হাত। এইভাবে কঠিন কাজও সহজ হয়ে ওঠে।'

তিনি বলেন, ভারতে কৃষিকাজের ভবিষ্যৎ অসীম সম্ভাবনাময়। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ কৃষিকাজকে একটু হেয় দৃষ্টিতে দেখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। বিবেক তাঁর কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সব রকমের কৃষি-প্রযুক্তির প্রয়োগ করছেন। তিনি ক্ষুদ্র সেচ পদ্ধতি অনুসরণ করছেন, যার ফলে বিভিন্ন রকমের ফসল একত্রে চাষ করা সম্ভব। তিনি জৈব কৃষিরও সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি যে জমির পাট্টা নিয়েছিলেন, তা ছিল অনুর্বর। জৈব কৃষির প্রয়োগে সেই জমিতে আজ 'সোনা' ফলছে।

কৃষিকাজে তাঁর এই প্রযুক্তিগত প্রয়োগ দেখা ও শেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে বহু কৃষক তাঁক কাছে আসছেন। তাঁর থেকে এই বিষয়ে শিখে অন্য কৃষকরাও এই নতুন ধরনের কৃষি-প্রযুক্তি অনুসরণ করে কৃষিকাজ শুরু করেছেন। ওই অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্ররাও বিবেকের কৃষিকাজের পাঠগ্রহণ করতে আসে। বিবেকের দেখানো পথে প্রেরণা সংগ্রহ করে অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবক কৃষিকাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বিবেকের সাহস ও কঠোর পরিশ্রম এক কথায় অপূর্ব ও অনবদ্য! এই দুই সিঁড়িতে ভর করে তিনি আজ সাফল্যের শিখরকে স্পর্শ করেছেন। □

সংসারের মায়া

এক গ্রামে এক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তার নাম মুকুন্দ দাস। সবাই তাকে খুব সম্মান করত। কিন্তু তার সংসারের প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল। তার মনে হতো সে না থাকলে তার ছেলেপুলেরা ভেসে যাবে, তারা না খেয়ে মারা যাবে। তার ছেলেপিলেরা বড়ো হয়ে গেলে একদিন

তাঁর গুরুদেব তাকে বললেন, তোমার ছেলেপিলেরা বড়ো হয়েছে, সংসারের দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি সন্ন্যাস নিয়ে সমাজের কাজে মন দাও। তাতেই তোমার ভগবান লাভ হবে। কিন্তু তার একই কথা, তার সংসারের কী হবে। গুরুদেব বললেন, ঠিক আছে, তুমি পরীক্ষা করে দেখ। তিনি হঠযোগের কতকগুলি পদ্ধতি তাকে শিখিয়ে দিলেন।

এরপর মুকুন্দ দাস একদিন তার পরিবারের সবার সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গেল। স্নান করতে করতে সে ডুব দিয়ে বহুদূরে একটি জঙ্গলের কাছে গিয়ে উঠল। তারপর সোজা হাঁটতে হাঁটতে গুরুদেবের আশ্রমে গিয়ে উঠল।

মুকুন্দ দাসের স্ত্রী ও পরিজনেরা অনেক খোঁজখবর করল। কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেয়ে তারা ধরে নিল যে সে মারা গেছে। বাড়িতে ফিরে এসে তারা যথাসাধ্য শ্রাদ্ধশান্তি সেরে ফেলল। গ্রামের লোকেরা আলোচনা করতে লাগল, বেচারি মুকুন্দ দাস তো মারা গেছে, এখন তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। সেইমতো গ্রামের লোকেরা ব্যবস্থা করে ফেলল। গ্রামের জমিদারের বাড়ি মুকুন্দ দাসের স্ত্রী রান্নার কাজ করতে লাগল। তার ছেলেদেরও কাজ পাইয়ে দেওয়া হলো। এখন তাদের অবস্থা আগের থেকেও ভালো হয়ে গেল।

বেশ কয়েক বছর পর মুকুন্দ দাসের স্ত্রী গুরুদেবের আশ্রমে এল। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেলেন। তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই তো? মুকুন্দ দাসের স্ত্রী বলল, যে মানুষ চলে যায়, তার অভাব তো পূরণ হবার নয়। তবে আমাদের সংসার আগের থেকে অনেক ভালো চলছে।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, আগের থেকে ভালো কী করে? গ্রামের লোকেরা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। স্বামী বেঁচে থাকতে ছেলেদুটো খুব অলস ছিল, কোনো কাজ করতে চাইতো না। বাপের হোটেলে খেয়ে সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়াতো। এখন আমিও কাজ করছি আর ছেলেদুটোও কাজ করছে। সংসারে কোনো অভাব নেই। উনি বেঁচে থাকলে এরা কোনো কাজই করত না।

মুকুন্দ দাস ঘরের ভেতরে বসে সবই শুনছিল। তারও বেশকিছুদিন পরে গুরুদের একদিন মুকুন্দ দাসকে বললেন, তুমি একবার বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসো। মুকুন্দ দাস সেইমতো একদিন রাত্রিবেলা নিজের বাড়িতে গেল। বাইরে থেকে সে দরজার কড়া নাড়াল। তার স্ত্রী ভেতর থেকে বলল, কে? মুকুন্দ দাস বলল, আমি, তোমার স্বামী, দরজা খোল।

স্বামীর গলার স্বর শুনে তার স্ত্রী ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, আরে সে তো মারা গেছে। এটা নিশ্চয় তার ভূত। সে বলল, আমি দরজা খুলবো না। মুকুন্দ দাস বলল, আমি মরিনি, দরজা খোল। তার স্ত্রী বলল, আমার ছেলেরা,তাদের বউরা আর নাতি-নাতনিরা তোমাকে দেখে ভয়ে মরে যাবে। তুমি চলে যাও।

মুকুন্দ দাস বলল, আমি না থাকলে কে তোমাদের দেখবে? তার স্ত্রী বলল, গ্রামের লোকের কৃপায় আমরা আগের থেকে খুব ভালো আছি। আমাদের জন্য তুমি কোনো চিন্তা করো না। দয়া করে তুমি এখান থেকে চলে যাও।

মুকুন্দ দাস বলল, তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই তো? তার স্ত্রী বলল, না, কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই। তুমি এসেছো, এটাই দুঃখের। তুমি না এলে আর কোনো দুঃখ নেই। দয়া করে তুমি আর এসো না।

মুকুন্দ দাসের ভ্রম দূর হলো। গুরুর কাছে ফিরে এসে সন্ন্যাস নিয়ে সমাজের সেবায় মন দিল।

রাজেন্দ্র কুমার

বীর বনবাসী

শম্ভুধন ফুংগলো

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামী শম্ভুধন ১৮৫০ সালে অসমের উত্তর কাছারের লংকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডিমাসা জনজাতির মানুষ ছিলেন। শম্ভু বাল্যকাল থেকেই শিবভক্ত ছিলেন। এক সময় ডিমাসা কাছারি এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। ইংরেজরা এই রাজ্যকে দখল করে। যুবক শম্ভু জনজাতি যুবকদের সংগঠিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই সময় ক্রুর শাসক মেজর বোয়াড ছিল। ১৮৮২ সালে শম্ভুধনের যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে মেজর বোয়াড মারা যায়। এরপর ১৮৮৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার ইংরেজ সৈনিক তার বাড়ি ঘিরে ফেলে। তখন তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। নিঃশস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। তিনি জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ার সময় এক ইংরেজ সৈনিক খুকরি ছুঁড়ে তাঁকে আহত করে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- ভ্যাটিকান সিটিতে এখনও পর্যন্ত মেয়েদের ভোটাধিকার নেই।
- সিঙ্গাপুরে চাষের জন্য একটিও জমি নেই
- রাজস্থানে করনিমাতা মন্দিরে ইঁদুরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়।
- বিশ্বের মধ্যে ভুটান একমাত্র দেশ যারা তামাক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।
- ঝিনুকে মুক্তা তৈরি হতে ১৫ বছর সময় লাগে।
- অজন্তা গুহা মন্দিরের সংখ্যা ২৭টি।
- প্রজাপতির দুই চোখের মধ্যে ১২ হাজার চোখ থাকে।
- শ্রীলঙ্কাকে দারুচিনির দ্বীপ বলা হয়।

ভালো কথা

পিঁপড়ে

আমার ঠাকুমা রোজ সকালে তুলসীতলায় বসে পুজো করে। সুর করে তুলসীমাতার গান করে। একটা রেকাবি করে কিছুটা চিনি রেখে দেয়। পুজোর পর চিনিগুলো ঠাকুমা কাউকে দেয় না। বলে, ওগুলো পিঁপড়েদের জন্য। বলে, চিনি দিলে ওরা তুলসীগাছ কাটবে না। তাছাড়া, ওরা খারাপ পোকামাকড় খেয়ে ফেলে আমাদের উপকার করে। আর বাড়িতে তুলসীগাছ থাকলে বাড়িতে রোগবালাই কম হয়। তাই তুলসীগাছের যত্ন করতে হয়।

বিদিশা দাস। তৃতীয় শ্রেণী, ব্যারেজ কলোনি,ফারাক্কা,মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ক ছ লা

(২) র ষ দূ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক্ষ হি র সা ক ব

(২) ভা স ন্ন ম বা প

৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) পরপীড়ন (২) পরমেশ্বর

৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) পরান্নধ্বংসকারী (২) পদ্মপলাশলোচন

উত্তরদাতার নাম

(১) অরিত্র দাস, বোলপুর, বীরভূম। (২) অমিত রায়, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০।
(৩) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মণ্ডহারবার দ: ২৪ পঃ (৪) মানসী ঘোষ, হুড়া, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

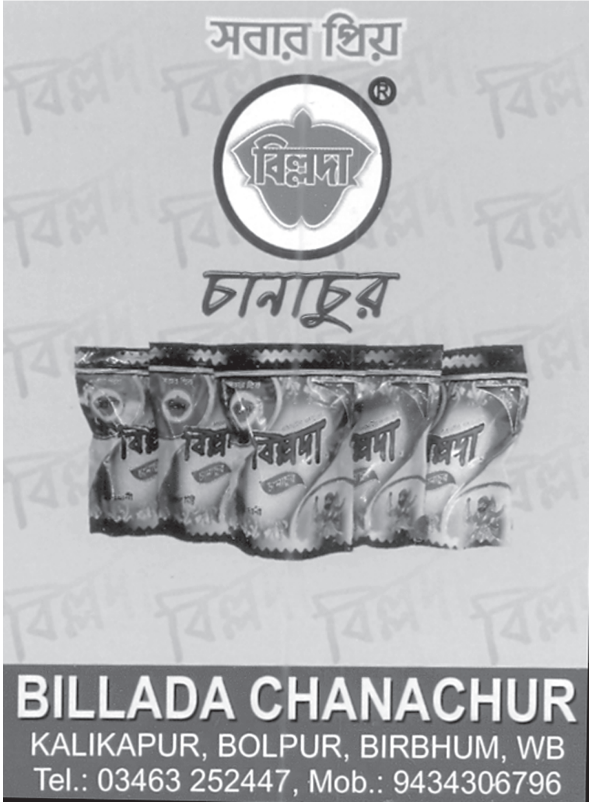

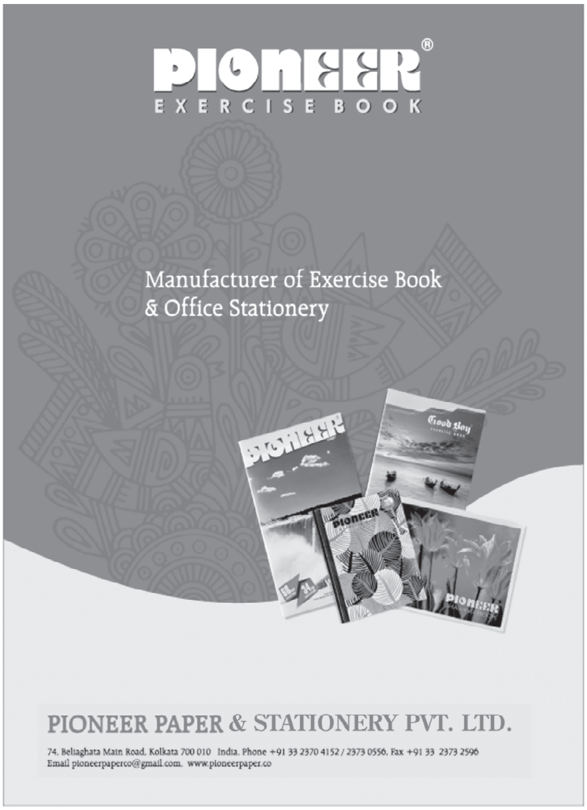

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান সুরাবর্দির মতোই

সাধন কুমার পাল

গত ২৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিলেন। এই বৈঠকে মমতার ভাতাজীবী কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ছাড়া কোনো বিরোধী দলের সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। এই মিটিঙে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের বক্তব্য শুনলে মানুষের মনে হবে পশ্চিমবঙ্গ স্তাবকতার রাজ্যে পরিণত হয়েছে। একজনও বললেন না ঐতিহাসিক তত্ত্বের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হোক। কবি সুবোধ সরকার তো বলেই ফেললেন তিনি নাকি ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস এই শব্দগুলোই শোনেননি। সবাই মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে গেলেন আপনি যা ঠিক করবেন আমরা সেটাকেই সমর্থন করব।

পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা বেশিরভাগ হিন্দু বাঙ্গালির অজানা। স্বাধীনতার পর দেশভাগের ষড়যন্ত্রীরা ক্ষমতায় থাকার জন্য পাঠ্যসূচির ইতিহাস থেকে দেশভাগের সেই কলঙ্কময় ইতিহাস তুলে দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই হিন্দু বাঙ্গালির সর্বনাশ করেও কংগ্রেস বছরের পর বছর এই রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেছে। সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো মরিচঝাঁপিতে হিন্দু বাঙ্গালিকে হত্যা করে, দণ্ডকারণ্যের মতো অনুন্নত এলাকায় পশুর মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য করেও বামপন্থীরা বছরের পর বছর এই রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেছে। মমতা ব্যানার্জি হিন্দু বাঙ্গালির আবেগের সঙ্গে জড়িত পশ্চিমবঙ্গের নাম পালটানোর পরিকল্পনা করে ইসলামিক বাংলাদেশের স্লোগান ‘জয় বাংলা’ এই রাজ্যের স্লোগানে পরিণত করেও বছরের পর বছর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারছে। হিন্দু বাঙ্গালির আত্মবিস্মৃতিকে মূলধন করে যোগেন মণ্ডলের মতো সংকীর্ণ ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে এই সমস্ত দল সেই অবিভক্ত ভারতের মুসলিম লিগের অসমাপ্ত অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য নবান্নের বৈঠক ইতিহাস সচেতন মানুষের হাসির খোরাক জুগিয়েছে। কারণ

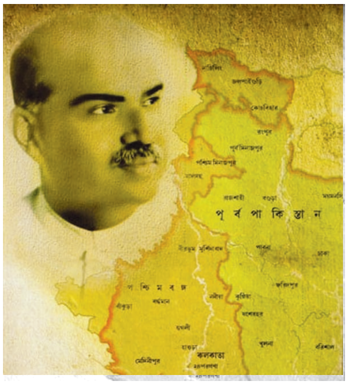

পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির জন্মদিন এরা নিজেদের মতো ঠিক করছে। কেউ বলছে পয়লা বৈশাখ হোক জন্মদিন, কেউ বলছে রাখি বন্ধনের দিন হোক। এরকম নানান মনগড়া প্রস্তাব নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ এই রাজ্যটা যেন টুপ করে আকাশ থেকে পড়েছে। এর যেন কোনো ইতিহাস নেই, এর যেন কোনো অতীত নেই, সবটাই যেন এরা নিজের হাতের তালুতে মন্ত্র দিয়ে গড়ে তুলেছে। কেউ কেউ বলেছে ২০ জুন তারিখটি নাকি পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা বেদনার দিন। সত্যিই এটি একটি বেদনার দিন। তবে সেই বেদনা হিন্দুদের নয় সেই বেদনা মুসলিম লিগ ও পাকিস্তানপন্থীদের। কারণ ওরা চেয়েছিল সমস্ত বঙ্গটাই পাকিস্তান ভুক্ত হয়ে যাক। সেদিন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গও যদি মিশে গিয়ে একটা অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ তৈরি হতো তাহলে আমরা যারা এখনো বাঙ্গালি হিন্দু হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিই তাদের অবস্থাটা কী হতো? আমরা কোথায় আশ্রয় নিতাম?

সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, তৃণমূলিদের কাছে আছে? তারা কোথায় রাজনীতি করতেন? এখানকার প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের অনেকেরই পূর্ববঙ্গে বাড়িঘর ছিল। কোথায় তারা তো সেখানটায় টিকতে পারলেন না বা তাদের পূর্বপুরুষরা সেখানে থাকার সাহস দেখাননি। এখানে এসে তারা সব ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেছেন। সে তো আমরা যোগেন মণ্ডলকেও দেখেছি মুসলিম লিগের সঙ্গে রাজনীতি করে পাকিস্তান তৈরি করে সেই পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। পরে নিজের জীবনটুকু বাঁচাতে পাকিস্তান থেকে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেদিন কলকাতাও যদি পাকিস্তানে চলে যেত তাহলে যোগেন মণ্ডল কোথায় আশ্রয় নিতেন? এই বিশ্লেষণের জন্য খুব বেশি ঐতিহাসিক বা পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। এই পশ্চিমবঙ্গের তো বিস্তীর্ণ এলাকা এখন হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। আপনারা যে সর্বনাশা রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি করেছেন তাতে আপনারা ইসলামাইজেশনের এই ধারা রোধ করতে পারবেন না, যতই ক্ষমতার বড়াই করুন না কেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে একমাত্র বঙ্গপ্রদেশেই মুসলিম লিগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন সুরাবর্দি। তখন থেকেই সুরাবর্দি সম্পূর্ণ বঙ্গকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। এটাই ছিল মুসলিম লিগের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে সুরাবর্দি কলকাতার বুকে ভয়ংকর হিন্দুহত্যা শুরু করেছিলেন। যা এখন ইতিহাসের পাতায় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে পরিচিত। কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু এবং নমঃশূদ্র নেতা যোগেন মণ্ডলকে পাশে বসিয়ে সুরাবর্দি কলকাতা শহিদ মিনারের জনসভা থেকে হিন্দু

ফঃ ৬

হত্যার ডাক দিয়েছিলেন।

গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেদিন সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল হিন্দুরা। পালটা মারে পিছু হটে সুরাবর্দির ঘাতক বাহিনী। কলকাতায় ব্যর্থ হয়ে মুসলিম লিগের জেহাদি বাহিনী ওই বছরে ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন নোয়াখালিতে নৃশংস হিন্দু নিধনযজ্ঞ শুরু করে। ইতিহাসের পাতায় যা নোয়াখালির দাঙ্গা হিসেবে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের উপর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। সমস্ত জায়গাতেই নিষ্ক্রিয় থাকে মুসলিম লিগ পরিচালিত সরকারের পুলিশ। হিন্দু জনগণ ও হিন্দু রাজনীতিকরা সেদিন বুঝে গিয়েছিলেন যে হিন্দু মুসলমান আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি তোলেন। কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায় ও সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র বসু অনেকটা মুসলিম লিগের ধাঁচেই দাবি করেন বঙ্গপ্রদেশ নিয়ে একটি আলাদা স্বাধীন দেশ তৈরি করতে হবে। কিন্তু এই দাবি হিন্দু নেতারা মেনে নেননি, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন বঙ্গের শাসন ক্ষমতা থাকবে মুসলমানদের হাতেই। সেক্ষেত্রে এই ধরনের স্বাধীন বঙ্গে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কোনোভাবেই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। তাই সেদিন হিন্দু বাঙ্গালিরা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দাবিকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছে সে সময় হুগলী জেলার তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হয়। বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য গঠন করা যা থাকবে ভারতের মধ্যে। সেদিন কংগ্রেস কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য নির্দলীয় হিন্দু রাজনৈতিক নেতারাও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু মহাসভার এই দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। অবশেষে স্থির হয় আইন সভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে ঠিক হবে অখণ্ড বঙ্গ ভেঙে হিন্দু বাঙ্গালির জন্য একটি রাজ্য হবে কিনা। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন সেই ঐতিহাসিক দিন যেদিন বাঙ্গলার আইন সভায় সেই ভোটাভুটি সম্পন্ন হয়। সেদিন রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত বাঙ্গালি হিন্দু রাজনৈতিক নেতা তাদের ঐক্য প্রদর্শন করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তারা ভোট দেন হিন্দু বাঙ্গালির পৃথক রাজ্যের পক্ষে। পৃথক রাজ্য গঠনের পক্ষে ভোট পড়ে ৫৮টি আর মুসলিম লিগের সমস্ত বিধায়ক ভোট দেন বঙ্গকে স্বাধীন রেখে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে। সেই পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ২১টি। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু, সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মীয় হেমন্ত বসুরাও সেদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোট দিয়েছিলেন পৃথক পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে। এভাবেই বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য পৃথক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ চলে যায় পাকিস্তানের দখলে। এবং সেই পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। অবশ্য মমতা ব্যানার্জিদের ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্য এই পশ্চিমবঙ্গেও এখন আর হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয় নয়। সেদিন যে ২১ জন বিধায়ক স্বাধীন বাঙ্গলার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, ভারতে বসেই প্রত্যক্ষভাবে ভারত বিরোধিতা করছিলেন। আর বর্তমানে মমতা ব্যানার্জিরা ওদের সুরে সুর মিলিয়েই হিন্দু বাঙ্গালির সুরক্ষার জন্য তৈরি হওয়া পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চাইছেন। আর মমতা অনুগামী পোষা বুদ্ধিজীবীরা বলছেন ২০ জুন বেদনার দিন। এই ইতিহাস জেনে মানুষ ঠিক করবেন যে ২০ জুন কাদের বেদনার দিন, পাকিস্তানপন্থী মুসলিম লিগের ঘাতকদের জন্য না শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের জন্য? পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন যে ৫৮ জন হিন্দু বাঙ্গালি বিধায়ক, তাঁরা হলেন : গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, প্রমথনাথ ব্যানার্জি, শিবনাথ ব্যানার্জি, সুশীল কুমার ব্যানার্জি, সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, মোহিনী মোহন বর্মণ, হেমন্ত কুমার বসু, জ্যোতি বসু, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, সতীশচন্দ্র বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী, বীণা দাস, রাধানাথ দাস, স্যার উদয়চাঁদ মহতাব, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, বিষাপতি মাঝি, ভূপতি মজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, আশুতোষ মল্লিক, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, বঙ্কুবিহারী মণ্ডল, কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জি, কালীপদ মুখার্জি, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, বাসন্তীলাল মুবারকা, খগেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, কানাইলাল দাস, কানাইলাল দে, হরেন্দ্রনাথ দলুই, সুকুমার দত্ত, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, অরবিন্দ গয়েশ, এ কে ঘোষ, বিমল কুমার ঘোষ, ডি গোমেস,ডম্বর সিংহ গুরু,ং ঈশ্বর দাস জানান, দেবী প্রসাদ খৈতান, চারু চন্দ্র মোহান্তি, অর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর, যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা, এল আর পেটনি, আর ই জেটল, আনন্দীলাল পোদ্দার, রজনীকান্ত প্রামাণিক, কমলকৃষ্ণ রায়, যোগেশ্বর রায়, শ্রীমতি ই এম রিকেটস, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিমল চন্দ্র সিংহ, জিসিডি উইলকিস।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এই ইতিহাসকে সব দিক থেকে অস্বীকার করে যারা সেই মুসলিম লিগের ভাবনাকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস করছে, বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য নতুন করে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন বানাতে চাইছে। তাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করতেই হবে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি হিন্দু বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ দিয়েছে এই ঘটনাকে। পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা জানে না বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গবাসী। তাই আজ আমরা স্মরণ করি সেই ৫৮ জন বীর যোদ্ধাকে যাঁদের ভোটে তৈরি হয়েছিল আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ। যা হিন্দু বাঙ্গালির একমাত্র আশ্রয়স্থল। □

ভ্রম সংশোধন

গত ১১ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ১৮ পৃষ্ঠায় 'মণিপুর নিয়ে কংগ্রেস এত সক্রিয় কেন?' প্রতিবেদনে চিত্রের ক্যাপশন 'রাহুল গান্ধী ও জর্জ সোরোস'-এর স্থলে হবে 'রাহুল গান্ধী ও কেনেথ জাস্টার'। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —সঃ স্বঃ

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন

নিলয় সামন্ত

ভারতের মহিলা ফুটবল দলকে নিয়ে বেশি আশাবাদী সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তাঁর মতে, পুরুষ দলের থেকে মহিলা দলের ফুটবল বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা বেশি। আন্তর্জাতিক স্তরে সুনীল ছেত্রীদের তুলনায় মহিলা দলের উন্নতির বেশি সম্ভাবনা দেখছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে মহিলা ফুটবলারদের সব রকম সুবিধা দিতে চান তিনি।

ফিফা ক্রমতালিকায় পুরুষদের থেকে এগিয়ে রয়েছেন মেয়েরা। বিশ্বে ভারতের পুরুষ ফুটবল দল রয়েছে ৯৯ নম্বরে। এশিয়ায় ১১ নম্বরে। এই তুলনা টেনে এনেছেন কল্যাণ। তিনি বলেন, ‘ফুটবল বিশ্বকাপে আমাদের পুরুষদের দলের তুলনায় মহিলাদের দলের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। বড়োদের এশিয়া কাপও হয়েছে। এই দুই প্রতিযোগিতা মহিলাদের ফুটবলের আরও উন্নতি করবে বলে মনে করেন তিনি। ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য ফিফাও উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কল্যাণ বলেন, ‘১৯৫০ সালে আমাদের পুরুষদের দল বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের খেলতে যাওয়া হয়নি। ১৯৫০ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ফিফার সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও যোগাযোগই ছিল না। এই সময়ে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা মেটানোর চেষ্টা করছি আমরা। এখনও অনেকটা পথ বাকি। তবে সেই পথে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছি আমরা। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি ভারতের মহিলা দল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।’

গত ছ’ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে ফেডারেশন কাপ। ২০২৩-২৪ মরসুম থেকে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতা আবার শুরুর পরিকল্পনা করেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। তবে পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ায় আরও এক বছর পিছিয়ে গেল ফেডারেশন কাপের প্রত্যাবর্তন। যে প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ১৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তা ফিরছে না এবারও।

আগে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ফেডারেশন কাপ করার কথা ভেবেছিলেন এআইএফএফ কর্তারা। সুপার কাপের পরিবর্তে ফেডারেশন কাপ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তাঁরা। কারণ, আইএসএল এবং আই লিগের দলগুলি সুপার কাপে খেলতে তেমন আগ্রহী নয়। ক্লাবগুলির উৎসাহ বৃদ্ধি করতে ঐতিব্যবাহী ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছিল।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ মরসুম থেকে আবার হবে ফেডারেশন কাপ। ভারতীয় দলের ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সুচির জন্য ২০২৩-২৪ মরসুম থেকে ফেডারেশন কাপ শুরুর পরিকল্পনা বাতিল করেছেন ফুটবল কর্তারা। এমনিতেই ক্লাবগুলি জাতীয় দলের শিবিরে দীর্ঘদিনের জন্য ফুটবলারদের ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। তার উপর ফেডারেশন কার হলে কতগুলি ক্লাব দল নামাতে রাজি হবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে আগাম যে সুচি দেওয়া রয়েছে, তাতে সুপার কাপের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই এই মরসুম থেকে ফেডারেশন কাপ শুরু করার কথা ভেবেছেন তাঁরা। প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্তন করার ভাবনাও রয়েছে কর্তাদের।

ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের প্রস্তাবে কেএসএফএ-এর সাধারণ সম্পাদক সত্যনারায়ণকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এআইএফএফ মহাসচিব শাজি প্রভাকরণ বলেছেন, ‘আজকে সমস্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সমস্ত সিদ্ধান্তে অংশ নেওয়ায় পরিবেশ অত্যন্ত উৎসাহজনক ছিল। আমরা ভারতীয় ফুটবল অ্যাজেন্ডা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছি, বিশেষ করে পাঁচটি নতুন ক্লাবকে হিরো আই-লিগে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত যা ঐতিহাসিক। এ জন্য আমি লিগ কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার জন্য আমি সত্যনারায়ণকে অভিনন্দন জানাই, যা সচিবালয়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রদান এবং উন্নতিতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের-এর শক্তি যোগ করবে।’ □

‘এক দেশ এক ভোট’ তা যতই কঠিন হোক না কেন, করতে হবে : তথাগত রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ‘এক দেশ এক ভোট’ প্রস্তাবের সমর্থন করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বিষয়টি নিয়ে টুইটও করেছেন তিনি।

লোকসভা ভোটের আগেই সারা দেশে এবার থেকে একটাই নির্বাচন প্রক্রিয়ার পথে হাঁটতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। এক দেশ এক নির্বাচন, এবার এই থিওরি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়েছে কেন্দ্র।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের তরফে একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সেই কমিটি গোটা দেশে একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বড়ো কোনো প্রস্তাব দিতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর মধ্যে, সেপ্টেম্বরে বিশেষ সংসদ অধিবেশনের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। জল্পনা শুরু হয়েছে, আগামী

১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ দিনের বিশেষ অধিবেশনেই এক দেশ এক নির্বাচন বিল পাশ করাবে মোদী সরকার।

এ ব্যাপারে তথাগতবাবু লিখেছেন, ‘এক দেশ এক ভোট’ একটি প্রশংসনীয় লক্ষ্য এবং তা অর্জন করতে হবে, তা যতই কঠিন হোক না কেন।

বর্তমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দেশটিতে চিরকাল নির্বাচন হয়ে চলেছে, যার ফলে মন্ত্রীরা তাঁদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য খুব কম সময় পান এবং অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সর্বদা উদার হন। ফলাফল হলো স্বল্পমেয়াদি উপশম-সহ লোককে খুশি করার রাজনীতির ধারাবাহিকতা।

১৯৬৭ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এটি এক দেশ এক ভোট ছিল। তারপর বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন সরকারকে বরখাস্তের কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং শেষ পর্যন্ত বর্তমান বিশৃঙ্খলা।

আমরা ব্রিটেন থেকে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা ধার নিয়েছি, সামান্য বুঝতে পেরেছি যে যুক্তরাজ্য একটি একক দেশ। আমাদের মার্কিন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত ছিল যেখানে নভেম্বর মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশের সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কোনও সরকার, একবার নির্বাচিত হলে, তার পূর্ণ মেয়াদ কাজ করতে পারে।

‘এক দেশ এক ভোট’ নীতিকে সমর্থন পিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ‘এক দেশ এক ভোট’ নীতি রূপায়ণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে)। ৪ সেপ্টেম্বর পিকে বলেন, “ভারতের পক্ষে এক দেশ এক ভোট ভালো। সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হলে ‘এক দেশ এক ভোট’ জাতীয় স্বার্থের অনুসারী”। দেশের মঙ্গলের জন্য এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তিনি শর্ত সাপেক্ষে তা সমর্থনে প্রস্তুত বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। ১৯৫২ পরবর্তী পর্যায়ে ১৭-১৮ বছর ধরে এই ‘এক দেশ এক ভোট’ ব্যবস্থা দেশে বলবৎ ছিল বলে তিনি জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, ভারতের মতো বড়ো দেশে প্রতি বছর প্রায় ২৫ শতাংশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের এই বৃত্তে ব্যস্ত থাকেন সরকার পরিচালনাকারীরা। নির্বাচন যদি এক বা দু’বারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তা দেশের স্বার্থে কাজে আসবে। এটি জাতীয় আর্থিক ব্যয় হ্রাস করবে, উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে না এবং এতে ভোটারদের

ক্লান্তি কমবে বলে দাবি করেন তিনি। এই উদ্যোগের ফলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গত ১ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে এই নির্বাচনী সংস্কারের উদ্দেশ্যে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী জানান যে এই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করলে সংসদে সেই রিপোর্টের বিষয়ে আলোচনা হবে। বেশ কয়েকটি রাজ্য এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ ব্যবস্থা বলবৎ করতে অতিরিক্ত ইভিএম, ভিভিপ্যাট যন্ত্র ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোগান ছাড়াও, ভারতীয় সংবিধানের ৮৩, ৮৫, ১৭২, ১৭৪ ও ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ সমূহে এবং ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে, নির্বাচন কমিশনের বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী জরুরি বলে তথ্যভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

'ভারত হিন্দু রাষ্ট্র'- জোরালো দাবি সরসঙ্ঘচালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত আবহমানকাল থেকে হিন্দু রাষ্ট্র। আর সেই কারণেই এদেশে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিক হিন্দু। সমস্ত ভারতবাসীর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে হিন্দুত্ব। নাগপুরের একটি অনুষ্ঠানে এমনটাই বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। তিনি আরও বলেন, এই কথাগুলি বুঝতে পেরেও মানতে চান না দেশবাসীর একটা অংশ। কারণ তারা স্বার্থপর। এর আগেও মোহনজী ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে জিনগতভাবে প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দু। গত ১ সেপ্টেম্বর নাগপুরে তরুণ ভারত সংবাদপত্রের একটি ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন সরসঙ্ঘচালক। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, হিন্দুস্থান তথা ভারত হলো হিন্দু রাষ্ট্র। এটাই সত্যি। সব ভারতীয়ই হিন্দু। আর হিন্দু মানে সকল ভারতীয়কেই বোঝানো হয়। আজ যতজন মানুষ ভারতে বসবাস করেন তারা সকলেই হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত।

হিন্দু রাষ্ট্র থেকে হিন্দু পূর্বসূরী সমস্ত কিছুর সঙ্গে হিন্দুত্বের যোগসূত্র রয়েছে। তিনি আরও বলেন, অনেকেই এটা অস্বীকার করেন। দীর্ঘদিনের অভ্যেস বশত নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেন না তারা। আবার কেউ কেউ স্বার্থপর। কেউ কেউ বুঝতে পারেননি যে তারা হিন্দু রাষ্ট্রের অন্তর্গত।

সংবাদপত্রের ভবন উদ্বোধন করতে গিয়ে সাংবাদিকতার ধরন নিয়েও মুখ খোলেন মোহনজী। তাঁর মতে, সমস্ত রকমের খবরই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। সঠিক তথ্য জানাতে হবে মানুষকে। কিন্তু নিজেদের আদর্শ বজায় রাখতে হবে। সমগ্র দুনিয়া হিন্দু আদর্শকে সমাদর করে, কারণ এর কোনো বিকল্প নেই।

সনাতন ধর্ম চিরন্তন সত্য : যোগী আদিত্যনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আগেও সনাতন ধর্মের ওপর অনেক আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এবারও কিছু ক্ষমতালোভী পরজীবীর জন্য কোনো ক্ষতি হবে না। সনাতন ধর্ম চিরন্তন সত্য। তার বিনাশ করা সম্ভব নয়। গত ৭ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশ পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে এভাবেই উদয়নিধি ও এ রাজার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে উদয়নিধির একটি মন্তব্য ঘিরে সম্প্রতি তোলপাড় হয়েছে দেশ। উদয়নিধি বলেছিলেন, সনাতন ধর্মকে মুছে ফেলা প্রয়োজন। করোনা, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো রোগের কেউ বিরোধিতা করে না। এগুলোকে নির্মূল করতে হয়। তেমনই সনাতন ধর্মের বিরোধিতা নয়, বিলুপ্ত করে ফেলতে হবে। এরপর ডিএমকে সাংসদ এ রাজা সনাতন ধর্মকে এইডস ও কুষ্ঠরোগের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উদয়নিধি বা এ রাজার নাম উল্লেখ না করলেও এইসব মন্তব্যের জবাব দিতে দেখা গেল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে। যোগীজী বলেন, রাবণের ঔদ্ধত্য সনাতন ধর্মের ক্ষতি করতে পারেনি। কংস সনাতন ধর্মকে নাড়াতে পারেনি। বাবর, ঔরঙ্গজেব এই ধর্মের কিছু করতে পারেনি, কিছু ক্ষমতালোভী পরজীবীও এই সনাতন ধর্মের কিছু করতে পারবে না। আদিত্যনাথ বলেন, কোনো কোনো সময় সনাতন ধর্মের ক্ষতি করতে গিয়ে কিছু লোক সমগ্র মানব সভ্যতাকে সংকটে ফেলে দিয়েছে। সনাতন ধর্ম সূর্যের মতো। কেউ মূর্খ হলেই একমাত্র সূর্যের দিকে থুতু ছোটাতে সাহস করে। যা কিনা ফিরে নিজের গায়ে লাগে। যারা মন্দির ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের ধ্বংস করেছে। ৫০০ বছর আগে সনাতন ধর্মকে কেউ অপমান করেছিল। আর আজ অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে। শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করছে বিরোধীরা। এতে কোনো কাজ হবে না। যোগী আদিত্যনাথ এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাবণ চেষ্টা করেনি? হিরণ্যকশিপু দেবতাদের অপমান করার চেষ্টা করেনি? কিন্তু তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। সনাতন ধর্ম হলো চিরন্তন সত্য। এই ধর্মের কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

জানুয়ারিতে উদ্বোধন রামমন্দিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সব কিছু ঠিক থাকলে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে। যখন জি-২০ সম্মেলন নিয়ে দিল্লি সরগরম তখন রাম মন্দির উদ্বোধনের চূড়ান্ত দিনক্ষণ স্থির করতে অযোধ্যায় বৈঠকে মিলিত হন শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কর্তারা। বৈঠকে ঠিক হয় আগামী ২১ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে কোনও একটি শুভ দিনে মন্দিরের উদ্বোধন করা হবে। সবটা ঠিক থাকলে ২২ জানুয়ারিতে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে রামলালা ও মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হবে ১৪ জানুয়ারি থেকে। রাম মন্দিরের প্রথমতলের কাজ প্রায় সম্পন্ন। যা বাকি আছে তা দীপাবলীর আগেই শেষ হয়ে যাবে। অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে বিশ্বের বৃহত্তম রাম মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৩৮০ ফুট, প্রস্থ ২৫০ ফুট, উচ্চতা ১৬১ ফুট। ৩৯২টি স্তম্ভ এই বিরাট মন্দিরকে ধরে রাখবে। সেগুন কাঠে তৈরি হচ্ছে মন্দিরের ৪৬টি দরজা। গর্ভগৃহের দরজা হবে স্বর্ণখচিত।

জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে এসে গত ৮ সেপ্টেম্বর ভারতের মাটিতে পা দিয়েই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক আবারও জানিয়ে দিলেন তিনি একজন গর্বিত হিন্দু এবং ভারত সফরে তিনি মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম ভারতে এলেন তিনি। বিদেশে জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঋষি কখনোই নিজের শিকড়কে, তাঁর যোগসূত্র ভারতকে ভুলে যাননি। ভারতে এসে তার প্রমাণ দিয়েছেন। ঋষি সুনক বলেন, "আমি গর্বিত হিন্দু। সেভাবেই আমি বড়ো হয়েছি। যেহেতু আমি কয়েক দিন এখানে রয়েছি, আমি আশা করছি আমি মন্দিরে যেতে পারবো"। হাতে বাঁধা রাখি দেখিয়ে সুনক বলেন, সদ্য রাখিবন্ধন উৎসব হয়েছে। আমার বোনেদের কাছ থেকে রাখি পেয়েছি। তবে কাজের চাপে জন্মাষ্টমী পালনের সুযোগ পাইনি। তবে এবার যদি কোনো মন্দিরে যেতে পারি হয়তো সেই আশা পূরণ হবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সেই প্রসঙ্গে হাসিমুখে সুনকের ব্যাখ্যা, "জীবনে কোনো কিছুতে আস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আমার মতো কাজের ক্ষেত্রে শক্তি সামর্থ্য থেকে স্থিরতা এগুলো পেতে কোনো নির্দিষ্ট ভাবনা বিশ্বাসে আস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি"। বিভিন্ন সময়ে ব্রিটেনে হিন্দুরীতি, উৎসব পালন করতে দেখা গেছে ঋষি সুনককে। ঋষি নিজে হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মে যে তিনি প্রবল ভাবে বিশ্বাসী তা বারবার সগর্বে বলেছেন।

ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার পর 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে। উপহারে পেয়েছেন রুদ্রাক্ষের মালা, ভগবত গীতা, হনুমান চালিশা। ৯ সেপ্টেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আয়োজিত নৈশভোজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। রবিবার, ১০ সেপ্টেম্বর সকালে বৃষ্টি মাথায় করে দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিলেন ঋষি সুনক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আসার কারণে রবিবার ভোর থেকে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল মন্দির চত্বর। ঈশ্বরের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেন সুনক দম্পতি।

জামা মসজিদ সহ বহু সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জামা মসজিদ-সহ ওয়াকফ বোর্ডের ১২৩টি সম্পত্তি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। এই সম্পত্তির মধ্যে দিল্লির জামা মসজিদ ছাড়াও দরগা ও কবরস্থান রয়েছে। মনমোহন সিংহ সরকারের সময়ে জামা মসজিদ ওয়াকফ বোর্ডকে দেওয়া হয়েছিল।

গত ৩০ আগস্ট কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১২৩টি সম্পত্তি ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে আবাসন ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের ভূমি ও উন্নয়ন অফিস ২ সদস্যের কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ওয়াকফ বোর্ডের থেকে ১২৩টি সম্পত্তি ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আপের বিধায়ক আমানতুল্লা খানকে এই সরকারি সিদ্ধান্তের সম্পর্কে জানিয়ে এর আগে চিঠিও দেওয়া হয়। ওয়াকফ বোর্ডের কাছে পাঠানো নোটিশে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে ভূমি ও উন্নয়ন দপ্তর ওয়াকফ বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র তৈরি করতে বলেছিল। যাতে বোর্ড ব্যাখ্যা করতে পারে, কেনো এই সম্পত্তিগুলি তাদের দেওয়া উচিত।

এর আগে ওয়াকফ বোর্ড দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছিল যাতে বলা হয়েছিল, এসব সম্পত্তি ভাঙা ও মেরামতের কাজ অন্য কেউ যেন না করে। কিন্তু মে মাসে হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এরপর কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে ওয়াকফ বোর্ডকে নোটিশ জারি করে বলা হয়েছে যে, আপনারা যদি এই সম্পত্তি চান তাহলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেশ করুন, না হলে এই সম্পত্তির দখল সরকার নেবে।

আবেদন

‘শত সহস্র নারী এবং পুরুষ পবিত্রতার উদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে, ঈশ্বরের প্রতি চিরন্তন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এবং সিংহের তেজে তেজবান হয়ে দরিদ্র পতিত এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য সহানুভূতি নিয়ে মাতৃভূমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বরাবর ছড়িয়ে পড়বেন। প্রচার করবেন পরিত্রাণের বাণী, সাহায্যের বাণী, সামাজিক উন্নয়নের বাণী এবং সাম্যের বাণী।’

— *স্বামী বিবেকানন্দ*

এক আহ্বান

- ✡ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে দুই বৎসর বা তার বেশি সময়ের জন্যে সেবাব্রতী হিসাবে যুক্ত হোন
- ✡ আপনি আপনার দেশবাসীকে ভালোবাসেন এবং তাদের জন্য কিছু করতে চান। সেই কারণে দুই বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য বিবেকানন্দ কেন্দ্রে সেবাব্রতী হিসেবে যুক্ত হতে পারেন।
- ✡ বিবেকানন্দ কেন্দ্র হলো এমন এক সংস্থা যার ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিকতা। সারা দেশে এই কেন্দ্রের ৮৩০টি শাখা রয়েছে।
- ✡ এখানে একজন সেবাব্রতীকে তাঁর মৌলিক চাহিদা এবং কাজের জন্য একটি সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁর নিজেকে বহন করার জন্য কর্মদক্ষতা এবং যোগ্যতা থাকতে হবে।
- ✡ যদি স্বামীজীর বাণী আপনার মধ্যে দেশমাতৃকার জন্য কোনো ভাবনার সৃষ্টি করে এবং আপনি ভারতমাতার উন্নতির জন্য কিছু করতে চান, তবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার আহ্বান জানাই।

——— যোগাযোগ ———

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কলকাতা

৭৬/২, বিধান সরণি, ফ্ল্যাট এক্স-৩, দ্বিতীয় তল
(স্টার থিয়েটারের সন্নিকটে)
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
ফোন - ৯১ ৯৪২০০২৩১৭৫
ই-মেইল : kolkata@vkendra-org

Advt.

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের পরপর কয়েকটি দিনের কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পথঘাট ভেসে গিয়েছিল নিরীহ হিন্দুদের রক্তে। সেই সময় হিন্দুদের পরিত্রাতা রূপে যিনি পথে নেমেছিলেন, তাঁর নাম গোপাল মুখার্জি। পারিবারিক সূত্রে পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল বলে লোকে তাঁর পদবির জায়গায় 'পাঠা' বলত। সেই অদম্য সাহসী হিন্দু রক্ষাকারী মানুষটির জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন **নারায়ণ চক্রবর্তী** তাঁর লেখায়— **ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক**।

বর্তমান ভারতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি বহুচর্চিত। সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রসঙ্গটিও। আর এই 'হিন্দুত্ব' শব্দটি গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি বিদ্বজ্জন সমাজে তুলে ধরেন সেই চন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও সমাজ ভাবনা নিয়ে লেখা--- **'হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু ও আর এস এস'। লিখেছেন— বিজয় আঢ্য।**

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই শুভ-অশুভ , দেব অসুরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নানান রূপে আজও প্রবহমান। মাতৃপূজার এই শুভ লগ্নে অসুরদলনী দেবী দুর্গার সেই অতুলনীয় বৈচিত্র্যময় এক রূপের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন **প্রবাল** তাঁর লেখা— **'অথ ত্রিলিঙ্গ কথা...'** য়।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে গান্ধীহত্যার ঘটনায় যুক্ত করার চক্রান্তের দিক উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক **সুজিত রায়** তাঁর রচনা— **নাথুরামের বিচার ঃ এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা'য়।**

আরও যাঁরা লিখেছেন—

দেবী প্রসঙ্গ
ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস
এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

পুরাণ কথা
নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প
সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জোশী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী , ড. পঙ্কজ কুমার রায়

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা